বাঙ্গলার পরিচিত পাখী

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়, এম্-এ (কলিকাতা)
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, ভূতপূর্ব্ব জাতীয় শিক্ষামন্দির
(কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির অধীন ১৯২০-২৪)
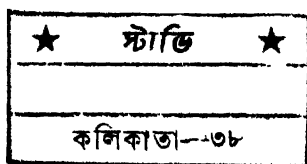
গঙ্গা পাবলিশার্স লিমিটেড
৫২·৭ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

পিতৃদেব

৺রসিকলাল রায়

তৃপ্যতাম্।

"পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা"

ভূমিকা

বাংলা দেশে আমি একজনকেই পক্ষিতত্ত্ববিদ বলিয়া জানি। তাঁহার নাম ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম্-এ, পি-এইচ-ডি। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অধীনে নিযুক্ত থাকা কালে, তাঁহার পক্ষী পর্য্যবেক্ষণ অভিযানে সহচর হইতাম ও পুস্তকাদি হইতে পক্ষী সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানাহরণ করিতে চেষ্টা করিতাম। এ সম্বন্ধে আমার উৎসাহ ও অভিনিবেশের জন্য আমি তাঁহার নিকট

সত্যবাবুর সাক্‌রেদী করিবার সময়, ১৯২১ সালে "সোনার বাংলা" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা কয়েকজন উৎসাহী যুবক মিলিয়া বাহির করেন। উহার নামমাত্র সম্পাদক ছিলেন দেশভক্ত ৺পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী। এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন "শনিবারের চিঠির" প্রথম সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস। তিনি আমাকে বাংলা দেশের সুপরিচিত পাখীদের বর্ণনা লিখিতে অনুরোধ করেন। ইংরাজিতে যেমন "ইহা", "ফ্র্যাঙ্ক ফিন" প্রভৃতি লেখক অবৈজ্ঞানিক সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিয়া পাখীর বর্ণনা লিখিয়াছেন, সেইরূপ রচনার জন্য যোগানন্দ বাবু অনুযোগ দেন। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয়কে সে কথা বলায় তিনিও উৎসাহ দেন। তখন আমি কয়েকটি পাখীর বর্ণনা লিখি। পরে "সোনার বাংলা" পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তৎসঙ্গে আমার লেখাও বন্ধ হয়। তাহার সাত আট বৎসর পর সুকবি শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "উপাসনা" পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তৎপরে "উপাসনা" যখন "বঙ্গশ্রী"তে রূপান্তরিত হইয়া শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের

সম্পাদনায় বাহির হইতেছিল তখনও ঐ পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণকুমার রায়ের অনুরোধে ২। ৩টী পাখীর বর্ণনা আমি লিখি। সজনীবাবু "বঙ্গশ্রী" পরিত্যাগ করার পর আমি আর লিখি নাই।

সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর পর হঠাৎ এক দুঃসাহসী প্রকাশকের সঙ্গে "প্রভাতী" সম্পাদক শ্রীমান মনীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দারের সৌজন্যে আমার পরিচয় হইল। তিনি পাখীর বই ছাপিবেনই। তাঁহাকে শ্রীকিরণ কুমার রায় আমার কথা নাকি বহুদিন পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। সেই জন্যই এই প্রয়াস। বাংলার সব পাখীর খবর আজকালকার কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার দিনে দেওয়া চলে না। মাত্র কয়েকটি পাখীর বর্ণনা এই বইতে আছে। অনেক সুপরিচিত পাখী বাদ গেল। যদি পাঠকদের ভাল লাগে তবে ক্রমশঃ অন্যান্য পাখীর কথাও লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

বলিয়া রাখি, আমি পক্ষি-বিজ্ঞানবিৎ নহি। পক্ষিতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মাত্র। অরসিক সাধারণ পাঠকের জন্য ইহা লেখা। বোধগম্য হইয়াছে কিনা তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। প্রাঞ্জল ও সরস হইয়াছে কিনা সমালোচকগণ বলিবেন। বৈজ্ঞানিক ভুল ত্রুটি থাকিলে আশাকরি সহৃদয় বৈজ্ঞানিক তাহা দেখাইয়া দিবেন, অসহিষ্ণু হইবেন না।

ভারতীয় পাখী সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠকের সুবিধার্থে পুস্তকের অন্তে কয়েকটি খ্যাতনামা বইয়ের নাম উল্লেখ করিলাম।

পুস্তকের শেষে একটি পরিশিষ্টে এই পুস্তকে বর্ণিত পাখীদের বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হইল। এ বিষয়ে ফনা অফ বৃটিশ ইণ্ডিয়া গ্রন্থমালাই প্রামাণ্য পুস্তক। ইহার প্রথম সংস্করণে জাতি হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করিয়া নামকরণ করা হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে আবার

অন্তর্জাতি বিভাগ আছে। দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্জাতির নাম ঢুকাইয়া নামটাকে দীর্ঘ করা হইয়াছে। আমি প্রথম সংস্করণের নামগুলিই দিলাম। যদি কেহ বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে চান, উহাতেই তাঁহার কাজ চলিবে, খুঁজিয়া লইতে অসুবিধা হইবে না।

শ্রীযোগরঞ্জন দাসগুপ্ত মহাশয় বহু পরিশ্রমে পাখীর ছবি আঁকিয়া দিয়া পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

১১৬, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা।
পিতৃপক্ষ, ১৩৫৫ সাল

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

৮৬ পৃঃ

কাঠঠোক্‌রা

দোয়েল

বাংলার এমন নগর বা গ্রাম নাই যেখানে এই পাখী তার সুললিত সুরের ধারায় দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া রাখে না। ইহাব দেহের বেশীর ভাগই উজ্জ্বল কুচকুচে কালো, দুইপাশের ডানার মাঝ বরাবর

দোয়েল
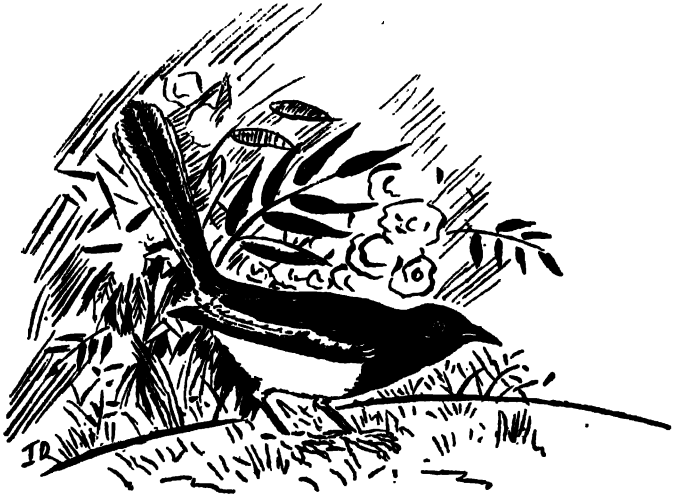
একটি ফেনশুভ্র রেখা। বক্ষের নিম্নভাগ সম্পূর্ণ শুভ্র। পুচ্ছের অধো-ভাগের পতত্রগুলিও সাদা এবং যখন সে লেজটিকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া পাখার মত বিস্তৃত করে, তখন লেজের এই সাদা পতত্রগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। দৈর্ঘ্যে পাখীটি আট ইঞ্চির অধিক নহে, কিন্তু

দেহের গঠন অতি সুঠাম। এর দেহের গঠনে এবং চালচলনে বেশ একটা লীলায়িত ছন্দ আছে। যখন সে পুচ্ছটিকে উচ্চে তুলিয়া গাছের ডালে কিংবা কোনও মাটির ঢিপির উপর অথবা ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসে, তখন মনে হয় সে সমস্ত বিশ্বচরাচরকে বলিতেছে—"আমার চাইতে সুন্দর কিছু দেখাও দেখি।" মানুষের সান্নিধ্যে সে বিচলিত হয় না এবং মনুষ্যাবাসের মধ্যেই বাস করিতে যেন সে পছন্দ করে। বাগানের অপ্রশস্ত পথে চলিতে চলিতে হয়তো দেখা যায় এই পাখী ঠিক পথের মাঝখানে ভূমির উপর বসিয়া কোনও কীটের স্বাদুতা পরীক্ষা করিতেছে। আপনাকে দেখিয়া সে নিঃশব্দে পাখা মেলিয়া উত্থান পূর্ব্বক অদূরে শাখাগ্রে যাইয়া বসিবে। শাখাটি খুব উঁচু নহে, হয়তো হাত বাড়াইলেই পাখীটিকে স্পর্শ করা যাইবে। সেখান হইতে কুঞ্চিত নয়নে আপনাকে লক্ষ্য করিবে। সমুখ দিয়া চলিয়া গেলে ত্রস্ত বা সঙ্কুচিত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিবে না। বাংলার পল্লীর স্থিরা প্রকৃতির বুকে এই ক্ষিপ্র, চঞ্চল পাখী তার চলাফেরার বিদ্যুৎগতি দিয়া একটা সঞ্জীবতার সঞ্চার করে।

অতি প্রত্যুষে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সে নিবাসবৃক্ষ ত্যাগ করে। কোনও একটি উচ্চ বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখার অগ্রভাগে বসিয়া গলা ছাড়িয়া সে উচ্ছ্বসিতভাবে প্রভাতবন্দনা করে। ইহার কণ্ঠস্বর সুদীর্ঘ শীষ, ধ্বনি খাদে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে উঠিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে নামিয়া শেষ হয়। মাঝে মাঝে আসন পরিবর্ত্তন করিয়া ঝাড়া দুই ঘণ্টা লহরীর উপর লহরী সুর ঢালিয়া চারিদিক ঝঙ্কৃত করিয়া তোলে। প্রকৃতির বুকে বাংলা দেশে আমরা যত রকম পাখী দেখি তার মধ্যে ইহারই গান মাধুর্য্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া স্বীকৃত। "শামা"কে বাদ দিলে দোয়েলই, শুধু বাংলার নহে, সমগ্র ভারতের গায়ক-পাখীদের মধ্যে প্রথম আসন অলঙ্কৃত করিতেছে। সঙ্গীত-

পারদর্শিতায় ও মধুরতায় "শামা"ই শ্রেষ্ঠ; তবে মুক্ত, স্বাধীন অবস্থায় শামার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় না, খাঁচার ভিতরেই শামার সঙ্গীত শ্রবণ করিবার সুযোগ আমাদের হইয়া থাকে। কেন না, শামা গভীর অরণ্য-নিবাসী। মনুষ্যাবাস হইতে বহু দূরে সে বাস করে।

সকালবেলা সমস্ত গ্রাম-প্রান্ত যখন বেশ কিছুক্ষণ রৌদ্রে স্নান করিয়াছে, তখনই সঙ্গীত থামাইয়া দোয়েল আহার অন্বেষণে মন দেয়। ভূমির উপর হইতেই এই পাখী আহার্য্য সংগ্রহ করে। বৃক্ষের উপর পত্রমধ্যে কিংবা শূন্যপথে সে খাদ্য সংগ্রহ করে না। এক একটা পাখীর খাদ্যসংগ্রহ করিবার স্থান ও রীতির প্রভেদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। খাদ্য অন্বেষণে আমাদের প্রাঙ্গণে, ছাঁচতলায়, দাওয়ার নীচে আসিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতে ইহা আদৌ সঙ্কোচ বোধ করে না।

কীট-পতঙ্গই ইহার একমাত্র ভোজ্য। শাকসব্জী ফলমূল ইহার মোটেই প্রিয় নহে। বেশীর ভাগ কীটভুক্ পাখীদের বিশেষত্ব এই যে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায় না। ইহার কারণ ইহাই অনুমিত হয় যে প্রকৃতির খয়রাতী লঙ্গরখানায় কীটপতঙ্গের প্রাচুর্য্য সর্ব্বত্র সমান নয়। অনেকগুলি পাখী একত্র থাকিলে আহার্য্যের পরিমাণ শীঘ্র শীঘ্র নিঃশেষিত হইবে সেইজন্য বোধ হয় ইহারা দূরে দূরে থাকে। লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে বাগানের এক একটা অংশে যেন এক এক জোড়া দোয়েলের কায়েমীস্বত্ব। প্রত্যেক দম্পতির এক এক একটা তালুক—যার চৌহদ্দীও বেশ নিশানা করা আছে। একজন নিজ চৌহদ্দীর বাহিরে অন্যের এলাকায় ভুলিয়াও যায় না। ভৌগোলিক আত্মনিয়ন্ত্রণে ইহারা স্বভাবসিদ্ধ।

দোয়েল এত অমিশুক যে তার গৃহিণীর সঙ্গেও সম্বন্ধটা খুব ঘনিষ্ঠ নহে। ভর্ত্তার মেজাজ খুব ভাল করিয়া জ্ঞাত থাকায়

দোয়েল-পত্নীও বেশ দূরে থাকে। কিন্তু পতিগতপ্রাণা দোয়েলজায়া পুরুষদোয়েলকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যায় না, কিঞ্চিৎ ব্যবধান রক্ষা করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। স্ত্রী-দোয়েলের দেহবর্ণে পুরুষ-দোয়েলের মত জৌলুস নাই। তবে স্ত্রী-পাখীর দেহের কালো অংশ ফিকে। দোয়েলজায়ার আদর বাড়িয়া যায় বসন্তকালে, কেন না সেই সময়টা প্রায় বেশীর ভাগ পাখীর মত এদেরও প্রজনন-ঋতু। তখন দোয়েল মহাশয়ের মনে পড়ে যে সারা শীতকাল যে নীরব সঙ্গিনী ছায়ার মত পিছনে পিছনে ফিরিয়াছে তাহার মনোরঞ্জন করা কর্ত্তব্য। এবং তখন এই কর্ত্তব্যটি সে খুবই নিষ্ঠার সহিত পালন করে। কণ্ঠে তখন তার স্বরের ধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; শাখা হইতে শাখান্তরে উড়িয়া পুচ্ছখানি গর্ব্বভরে বিস্তার করিয়া বেড়ায়। জীবন-সঙ্গীর রূপলালিত্যে ও কণ্ঠমাধুর্য্যে আত্মহারা হইয়া নীড়োপবিষ্টা দোয়েলপত্নী ডিম ফুটানোর একঘেয়ে কাজের অবসাদ ভুলিয়া থাকে। পুরুষ দোয়েলই সুরসিদ্ধ, স্ত্রীপাখীটির কণ্ঠে ধ্বনি নাই।

স্ত্রী ও পুরুষ দোয়েল পরস্পরের জীবন-সঙ্গীই বটে। এক জোড়া পাখীর একটির মৃত্যু না ঘটিলে অপরটি আর অন্য সঙ্গী গ্রহণ করে না। —ইহা আমার শোনা কথা, নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ নহে।

বাগানের বৃক্ষশ্রেণীর নীচে যেখানে আলোছায়ার অনবরত লুকোচুরি চলে, সেইখানে দোয়েল সারাদিন বিচরণ করে। তাহার দেহের সাদাকালো বর্ণ সেই আলোছায়ার সঙ্গে খাপ খায়। চুপ করিয়া স্থিরভাবে যখন সে কোনও শাখাগ্রে বসিয়া থাকে, চট্ করিয়া সে নজরে ধরা পড়ে না। প্রকৃতি এইরূপেই তাঁর সৃষ্ট জীবের জন্য শত্রুর হাত হইতে আত্মগোপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দিবসের পূর্ব্বাহ্নেই দোয়েলের কণ্ঠকাকলী উচ্চগ্রামে থাকে।

দ্বিপ্রহর হইতেই কণ্ঠধ্বনি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যখন পশ্চিম আকাশে দিগন্তব্যাপী সোনালী সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া সূর্য্য অস্তগামী হয়, তখন দোয়েল আবার উচ্চ বৃক্ষচূড়ে আরোহণ করিয়া তার তান সপ্তমে তুলিয়া অস্তরবির বিদায়বাণী গাহিয়া লয়। বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালেই দোয়েলের কণ্ঠধ্বনির তীব্রতা থাকে। বর্ষান্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠলালিত্য মন্দীভূত হইয়া আসে—শীতকালে তাহাকে কচিৎ শোনা যায়। শীত যখন শেষ হয়, ধরণীর দুয়ারে বসন্ত যখন আবার জাগ্রত হইয়া উঠে, তখন দক্ষিণ হাওয়ার আভাসের সঙ্গে সঙ্গে দোয়েল সজাগ হইয়া উঠে। আবার তাহার সুরের মদিরায় প্রকৃতি হর্ষে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়ে।

যদিও ইহারা অসামাজিক পাখী, দলবদ্ধ হইয়া থাকে না, তবু বসন্তের প্রারম্ভে অনেক সময় ইহাদিগকে দলবদ্ধভাবে কুস্তী-প্রতিযোগিতায় রত দেখা যায়। এই সময় বাগানের একটা স্থানে কেহ ভূমির উপর, কেহ বা নিম্নশাখাগ্রে বসিয়া কলরব করিতে থাকে। মধ্যখানে, ভূমির উপর দুইটি দোয়েলকে জড়াজড়ি, ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে দেখা যায়। একটি পরাজিত হইলে সে দূরে সরিয়া গিয়া বিস্রস্ত পালকগুলিকে চঞ্চুদ্বারা বিন্যস্ত করিতে থাকে। বিজয়ী পাখীটির সঙ্গে অন্য একটি আসিয়া মল্লযুদ্ধে লাগিয়া যায়। দর্শক পাখীগুলি সোল্লাসে উৎসাহ দিতে থাকে। এইরূপে একটির পর একটি বলপরীক্ষা হইয়া গেলে সকলে গোলমাল করিতে করিতে নিজ নিজ নিবাসস্থানে প্রস্থান করে। কোনও কোনও লেখক মনে করেন যে এই প্রতিযোগিতা উদ্দেশ্যবিহীন ক্রীড়ামাত্র নহে। প্রজননঋতুর প্রারম্ভেই এরূপ হইয়া থাকে। অতএব কোনও স্ত্রীপাখীর প্রেমলাভের জন্যই এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুষ্ঠান হয় এবং বিজয়ী পাখী বীর্য্যশুল্কে পত্নীগ্রহণ করে।

কীটভুক্ এই পাখী আমাদের বাগানের ফলমূল ও শাকসব্জীর অনিষ্টকর অনেক কীটপতঙ্গ দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া উদ্ভিদের নিরাপদে বৃদ্ধির সহায়তা করে। সুতরাং ইহার একটা ইকনমিক বা অর্থ নৈতিক মূল্য আছে। ইহাকে বন্দী করা, নির্য্যাতন করা কিংবা ধ্বংস করার চেষ্টা মানুষের স্বার্থের প্রতিকূল।

সকাল-সন্ধ্যা কুটীর-পার্শ্ব হইতে যে আমাদের কর্ণে সুরধারা বর্ষিত করে তাহাকে খাঁচায় পুরিবার চেষ্টা না করাই ভাল। সাধারণতঃ কীটভুক্ পাখীকে খাঁচা-বন্দী করিয়া বাঁচানো যায় না। শামা কীটভুক পাখী হওয়া সত্ত্বেও খাঁচায় নিজেকে মানাইয়া লয়, কণ্ঠমাধুর্য্য তাহার নষ্ট হয় না। কিন্তু উচ্চবৃক্ষের অগ্রভাগে বসিয়া যাহার গান গাওয়া স্বভাব, খাঁচার সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে তাহার গান স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইতে পারে না। বোধ হয় সেই কারণেই পক্ষিপালকদের মধ্যে একে বন্দী করিয়া রাখিবার রেওয়াজ কম।

লোকালয়-বাসী এই পাখী মনুষ্যাবাসের কাছাকাছিই নিজ শাবকোৎপাদন কার্য্য সম্পন্ন করে। সুতরাং পাঠক ইচ্ছা করিলে ইহার নীড়-রচনা প্রভৃতি কার্য্য অনায়াসে লক্ষ্য করিতে পারেন। দেয়ালের গর্ত্তমধ্যে, বৃক্ষ-কোটরে বা চালের নীচে এরা বাসা রচনা করে। শুষ্ক তৃণ, সূক্ষ্ম শিকড়, তন্তু, পাখীর পালক প্রভৃতি দ্বারা গহ্বরের অভ্যন্তর আস্তৃত করিয়া তদুপরি ডিম্বরক্ষা করে। প্রায় ক্ষেত্রেই চার-পাঁচটি ডিম একটি বাসায় দেখা যায়। ডিমগুলির রং সবুজাভ শ্বেত; কদাচিৎ সবুজাভ হালকা নীল, রক্তাভ চিহ্ন-সমন্বিত। একজোড়া দোয়েল একবার যেখানে বাসা রচনা করে, প্রায়শঃ দেখা যায় প্রতি বৎসর তারা সেইখানেই ফিরিয়া আসিয়া সেই কোটরটি ব্যবহার করে —অন্য ঋতুতে আহার অন্বেষণে তাহারা যতদূরেই যাক। অবশ্য গ্রাম ছাড়িয়া তাহারা যায় না, কেন না ইহারা যাযাবর নহে।

শ্যামা

শ্যামা আমাদের সুপরিচিত পাখী। সুকণ্ঠ গায়ক পাখী হিসাবে ভারতবর্ষে শ্যামা শ্রেষ্ঠতম। বাঙ্গালী কবিগণ সর্ব্বদা 'শ্যামা'র উল্লেখ করেন। এই পাখীর কথা আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু একে চিনি না। না চিনিবার কারণ পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি—শ্যামা গভীর অরণ্য-নিবাসী। একে জানিতে হইলে খাঁচার ভিতর এর সঙ্গে পরিচয় করিতে হইবে।

"শ্যামা" নামটি মূলতঃ সংস্কৃত কি ফারসী, বলিতে পারি না। আমার মনে হয় মোগল বাদশাহেরাই পক্ষিপালনে পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁহারাই ইহাকে খাঁচায় ধরিয়া ইহার সঙ্গীতমাধুর্য্য উপভোগ করার রীতি প্রচলিত করেন। মোগল বাদশাহেরা বহুতর বর্ণসঙ্কর গৃহপারাবত উৎপাদন করান; বুলবুল পাখীর মল্লক্রীড়ার রীতি প্রচলিত করেন। সুতরাং এ অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে অরণ্যবিহারী এই সুন্দর, সুঠাম ও সুগায়ক পাখীকে আবিষ্কার করিয়া মানুষের আনন্দলাভের জন্য তাঁহারাই পালন করিতে আরম্ভ করেন। ইহাকে "শ্যামা" বানানে চালাইতে চাহিল হয়তো হিন্দুচিত্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য যে লজ্জিত হইবে না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। প্রাক্-মুসলমান ভারতে খাঁচায় পাখী অপরিজ্ঞাত ছিল না বটে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে যে কয়টি গৃহপালিত পাখীর উল্লেখ পাই, তাহারা সকলেই মুক্ত অবস্থায় লোকালয়ের কাছে কাছেই ফেরে—যেমন, শুক, সারিকা, ভবনশিখী, পারাবত। এমন কি যে বুলবুল পাখী ভারতে প্রচুর ও সুলভ তাহার নামটি আরবী। এ কথা কোনও বৈজ্ঞানিক বলেন নাই যে মধ্য-যুগে

সহসা কেহ বিদেশ হইতে বুলবুল আনয়ন করিয়া ছাড়িয়া দেন এবং গত চার-পাঁচ শত বৎসরে সারা দেশকে সে ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাহান্ন-তিপান্ন রকমের বুলবুল ভারতবর্ষে বাস করে, সুতরাং ওরূপ দাবী কেহ করিতে পারে না। সুতরাং এই পাখী নিশ্চয়ই কালিদাসের সময়েও ছিল—কিন্তু কালিদাসের সাহিত্যে তাহার নাম নাই কেন? থাকিলেও কি নামে আছে? শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় কালিদাসের সাহিত্য তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়া তন্মধ্যে যতগুলি পাখীর নাম পাওয়া যায় তাহার ফিরিস্তি করিয়া উহাদের আধুনিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও সংস্কৃত সাহিত্যে বুলবুলকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এতখানি যুক্তির জঞ্জাল সৃষ্টি করিতে হইল এই জন্য যে আমার মতে এই পাখীর নামের বানান বাংলায় "শ্যামা" না হইয়া "শামা" হওয়া উচিত।

শামার দেহে বর্ণসমাবেশ অনেকটা দোয়েলের মত। ইহার মাথা, গলা, ঘাড়, পিঠ ও বুক চিকণ কালো। দেহের নিম্নভাগ দোয়েলের যেখানে সাদা, ইহাদের সেখানে উজ্জ্বল খয়ের বর্ণ—ইংরাজীতে যাহাকে বলে চেষ্টনাট। জঙ্ঘা দুটি সাদা। দেহের উপর দিকে পুচ্ছটি যেখানে আরম্ভ হইয়াছে সেখানটা ও তাহারই নিম্নদিকে, অর্থাৎ বস্তি-প্রদেশ, ফেনশুভ্র। উত্তেজিত হইলে উপরদিকের হ্রস্ব শুভ্র পালকগুলি ফুলিয়া খুব সুন্দর দেখায়। ডানার পালকগুলি ঘন বাদামী। শামার পুচ্ছটি শুধু দেখিতে সুশ্রী নয়, ইহার দেহের একটা বিশেষ অঙ্গ, কেননা আসল শরীর অপেক্ষা পুচ্ছটি দীর্ঘ এবং দোয়েলের মতই ক্ষণে ক্ষণে ইহাকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মিলিটারী ভঙ্গী করা ইহারও স্বভাব। লেজের মধ্য-পালক দুটি দীর্ঘতম, তৎপর দুই পার্শ্বের পালকগুলি ক্রমশঃ হ্রস্বতর হইয়াছে। মাঝখানের দুই জোড়া পুচ্ছ-পালক সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ। অপর গুলির অগ্রভাগ শুভ্র এবং বাহিরের দিকের পতত্রগুলি প্রায় সম্পূর্ণ

শামা

শুভ্র। যখন পুচ্ছটি গুটাইয়া রাখে তখন মনে হয় দুই পার্শ্বে দুইটি সাদা রেখা পড়িয়া আছে।

গভীর অরণ্যানীমধ্যে ইহার বাস বলিয়া বাংলা দেশের বেশীর ভাগ অঞ্চলে ইহাকে পাওয়া যায় না। তবে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার যে অংশ ছোটনাগপুরের পাশে সেই সব স্থানে, আসাম-প্রান্তে কতকগুলি স্থানে এবং হিমালয়ের পাদমূলের যে অংশ বাংলার মধ্যে পড়িয়াছে সে সব স্থানে ইহাকে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত অরণ্য-প্রদেশেই একে পাওয়া যায়—সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত।

শুধু যে গভীর অরণ্যেই ইহারা বাস করে তাহা নহে। দোয়েলের মত বৃক্ষচূড়ায় বা ঐরূপ উন্মুক্ত স্থানেও সে আসে না। অত্যন্ত ঘন পত্রবীথী বা ঝোপের মধ্যেই সে বিচরণ করে, ভূমি হইতে অধিক উর্দ্ধে ওঠে না। কীটভুক্ পাখী হিসাবে, ভূমির উপর বা তাহার নিকট যে সব কীট পাওয়া যায় তাহাই শিকার করা ইহার অভ্যাস। দোয়েলের মত আগডালে উঠিয়া গান গাওয়া ইহার অভ্যাস নয়। নিম্নশাখায় বসিয়াই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠধারা দ্বারা সে বনানী মুখরিত করে—কিন্তু সামান্য শব্দেই চমকিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ঘন পত্রান্তরালে আত্মগোপন করে। দোয়েলের মত সপ্রতিভ সে আদৌ নহে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, খাঁচায় যখন বন্দী হয় তখন ইহার সব সঙ্কোচ কাটিয়া যায়। পক্ষিগৃহমধ্যে ইহাকে বেশ সাহসী পাখী হিসাবেই দেখিয়াছি। আরও একটা আশ্চর্য্য এই যে স্বাধীন জীবনে ইহা আমিষাশী—কিন্তু মনুষ্যগৃহে ইহা আমিষ ও নিরামিষ দ্বিবিধ আহারই তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করে।

দোয়েলের মতই ইহার প্রকৃতি অসামাজিক, দলবদ্ধভাবে থাকে না এবং দোয়েলের মতই স্ত্রীপাখিটিকে প্রজননঋতু ছাড়া অন্য ঋতুতে বেশী কাছে আসিতে দেয় না। স্ত্রীপাখীর গাত্রবর্ণ পুরুষ-পাখীর মত, তবে নিষ্প্রভ ও ঔজ্জ্বল্যহীন

স্বাধীন অবস্থাতে দোয়েল মানুষের আশেপাশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, গান গায়, খাদ্য অন্বেষণ করে। শামা স্বাধীন অবস্থায় অত্যন্ত ভীরু। হয়তো ঘন পত্রবীথী মধ্যে বসিয়া প্রাণ ঢালিয়া গান করিতেছে, একটু কোথাও শব্দ হইল, অমনি অর্দ্ধপথে সঙ্গীত থামাইয়া শব্দের বিপরীত দিকে অন্ধের মত ছুট দেয়। অথচ এই পাখী যখন মানুষের গৃহে আসিয়া খাঁচার মধ্যে আশ্রয় পায়, তখন মানুষের সান্নিধ্যে একটুও বিচলিত হয় না। ইহাদের স্ত্রীপাখিটিও পতির নিঃশব্দ সঙ্গিনী। প্রজনন-ঋতুতে পুরুষশামা অপর পুরুষশামা কাছে দেখিলে অগ্নিশর্ম্মা ও মারমুখো হইয়া উঠে। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহার পক্ষীগৃহে অনেক সময় আমরা প্রবেশ করিয়া শামাকে আহার দিতাম, খড়কুটা আগাইয়া দিতাম নীড় রচনার জন্য। সেই সময় আমি শামার শীষ অনুকরণ করিতাম: আমার শীষ শুনামাত্র পুরুষপাখী চঞ্চল হইয়া উঠিত। সে মনে করিত যে স্ত্রীশামাটির আর একজন বুঝি প্রণয়প্রার্থী আসিয়াছে। শেষে যখন বুঝিত যে আমারই শরীর অভ্যন্তর হইতে এই ধ্বনি উত্থিত হইতেছে তখন এই ঈর্ষান্বিত পাখী ভয় ত্যাগ করিয়া আমার মস্তকে ছোঁ মারিয়া চঞ্চুপুটে আঘাত হানিত।

আশ্চর্য্যের বিষয় গভীর জঙ্গলবাসী এই পাখী, পক্ষিগৃহে নীড় রচনা ও সন্তান উৎপাদন করে। মুক্ত অবস্থায় বৃক্ষকোটরে নীড় রচনা করে। ভূমি হইতে দুই ফুট হইতে কুড়ি ফুট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত ইহারা নীড় তৈরী করে। অনেক সময় অন্য পাখীর পরিত্যক্ত কোটরও ইহারা বাছিয়া লয়। গর্ত্তটিতে তিন ইঞ্চি পুরু শুকনা পাতার গদি তৈয়ারী করিয়া তদুপরি ছোট ছোট কাঠি পাতিয়া তৃণদ্বারা আস্তৃত করিয়া নীড় তৈরী করে। তদুপরি গোটা চারেক ডিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই ডিমগুলি ক্ষুদ্র, সম্পূর্ণ গোলাকৃতি নয়—ডিমের রঙ ফিকে সবুজের

উপর গাঢ় বাদামী অর্থাৎ লালচে ছিটে—ছিটেগুলি স্থানে স্থানে ঘনসন্নিবিষ্ট।

এদেশে এখনও যাহাদের আমরা নিম্নশ্রেণী বলি তাহারা ইহাকে খাঁচায় পোষে। খাঁচাটি সর্ব্বদাই কাপড়ে ঢাকিয়া রাখে। ধনীরা ইহাকে পূর্ব্বে রাখিতেন। গাছপালাযুক্ত পক্ষিগৃহে ইহাকে রাখিলে, ইহারা আনন্দেই থাকে এবং স্ত্রীসহচর পাইলে নীড় রচনা ও সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে দেখিয়াছি।

বুলবুল

বুলবুল বাংলাদেশের তথা সারা ভারতবর্ষের একটি অতি সাধারণ সুপরিচিত পাখী। সহরে, নগরে, পল্লীতে—সর্ব্বত্র একে দেখিতে পাওয়া যায়। দোয়েলের মত ইহাদের কণ্ঠস্বর লহরীর উপর লহরী, পর্দ্দার উপর পর্দ্দা ওঠে না বটে, সুমিষ্ট দীর্ঘ শীষও এদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় না। কিন্তু যে দুই তিনটি হ্রস্ব স্বর ইহারা সারাদিন, অবিরাম উচ্চারণ করে তাহা লঘু, সুমিষ্ট ও সুশ্রাব্য।

পারস্যের কবিরা যে গুল্‌চুমী বুলবুলের কণ্ঠলালিত্যে বিমোহিত হইয়া তাহাকে সাহিত্যে অমর করিয়া গিয়াছেন—তাহার সহিত আমাদের অতি-পরিচিত বুলবুলের আদৌ কোনও সম্বন্ধ নাই—নামটা ছাড়া। পারস্যের বুলবুলকে অনেকে "বুল্‌বুল-এ-বোস্তাঁ" বলেন। এই "বুলবুল-এ-বোস্তাঁ" ইংরেজ কবিদের স্কাই-লার্ক বা নাইটিঙ্গেল। এই পাখী ভারতের অধিবাসী না হইলেও শীতকালে পাঞ্জাব প্রদেশে চেঞ্জে আসিয়া থাকে। পাঞ্জাবের পূবদিকে বা দক্ষিণ দিকে সে আর অগ্রসর হয় না—গরম দেশকে সে পছন্দ করে না। এই স্কাইলার্ক বা "বুলবুল-এ-বোস্তাঁ"র জ্ঞাতি অবশ্য আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে আছে। তাহার নাম "ভরত"—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয়ের মতে সংস্কৃত সাহিত্যের "ভরদ্বাজ-পক্ষী"। তবে "ভরত" পাখীকে ঠিক বাঙ্গালী পাখী বলা চলে না। ইহা একেবারে "মেড়ো"। হয়তো বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের পশ্চিম সীমান্তে দেখা যাইতে পারে। আমাদের বুলবুলকে "গায়ক" পাখী বলা চলে না। সুতরাং যে সব বাঙ্গালী কবিদের গজল গানে বুলবুল পাখী চুলবুল করে তাঁহাদের প্রকৃতি-পরিচয় একটু ধোঁয়াটে রকমের স্বীকার করিতেই হইবে।

"শামা" প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি যে বুলবুল পাখীর জনপ্রিয়তার জন্য মোগল পাদশাহ্‌রাই দায়ী। তাঁহাদের আমল হইতেই ইহার জনপ্রিয়তা এদেশে খুব বেশী। ইহারা একাকী বিচরণশীল, কলহপ্রিয় পাখী নহে। কিন্তু ইহাদের চরিত্রে ক্ষত্রিয়সুলভ তেজ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাব আছে। "যুদ্ধং দেহি" বলিলে ইহারা অতিথি-সৎকারে পশ্চাৎপদ হয় না। ইহাদের এই প্রকৃতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া মানুষ কিঞ্চিৎ আনন্দলাভের পদ্ধতি বাহির করিয়াছে। এ দেশের ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে সৌখীন ব্যক্তিমাত্রই বুলবুল পুষিতেন এবং প্রজনন-ঋতুতে মোরগের লড়াইয়ের মত ইহার দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রতিযোগিতা করাইতেন। বাংলাদেশে এই রেওয়াজ একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। পশ্চিম প্রদেশে এখনও টিকিয়া আছে, যদিও ইংরাজী-শিক্ষাভিমানীদের পাখী পোষার সখ হ্রাস পাইতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একবার অজন্তার পথে নিজাম-রাজ্যে গিয়াছিলাম। তখন বুলবুলের লড়াই সেখানে মহা-সমারোহের ব্যাপার ছিল। আমাদের দেশের কুস্তী বা পাশ্চাত্য দেশে বক্সিং প্রতিযোগিতা যেমন জনসমাজে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, হায়দ্রাবাদে বুলবুলির লড়াইয়ের ঋতুতেও সেইরূপ হইত। জয়ী পাখীর পালন-কর্ত্তা পাঁচ ছয় হাজার টাকা পর্য্যন্ত প্রাইজ পাইতেন। হয়তো তেহিনো দিবসা গতা। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও লক্ষ্ণৌ সহরে নবাবী গন্ধের সৌখীন বাবু সাহেবগণ একটি বুলবুলকে বামহস্তের তর্জ্জনীর উপর বসাইয়া সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতেন। কোনও প্রাসাদ-অলিন্দে ঝরোখা-মধ্যে উপবিষ্টা সুন্দরী ললনাকে দেখিতে পাইলে হস্তস্থিত বুলবুলের বন্ধন-সূত্র খুলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন। শিক্ষিত পাখী উড়িয়া গিয়া ঝরোখা-উপবিষ্টা তরুণীর ললাট-শোভা উজ্জ্বল টিক্‌লীখানি অতর্কিতে চঞ্চুপুটে খুঁটিয়া লইয়া প্রভুকে তাহা সমর্পণ করিত। অপ্রতিভ সুন্দরীর কপট-কোপন কটাক্ষের বাণ খাইয়া নবাব সাহেব
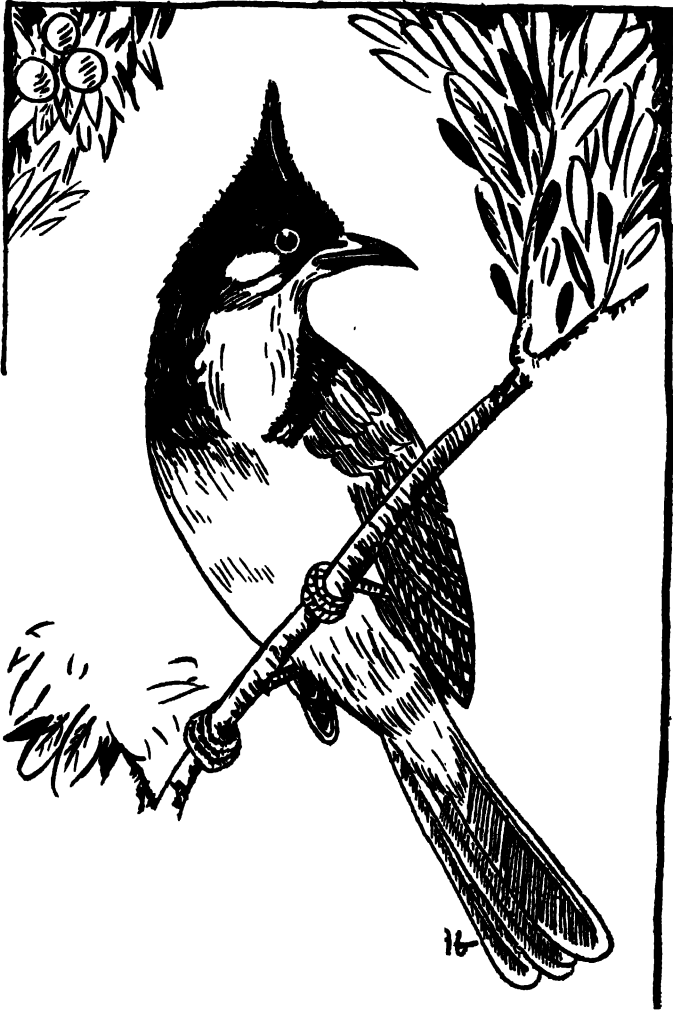
সিপাহী বুলবুল বা কানাড়া বুলবুল

অসীম পুলকিত হইতেন। কছুর সতের পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলাম—সে নবাবরা নাই, সেই ঝরোখায়-উপবিষ্টা বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত-নয়নাগণও নাই, বুলবুল-কর্ত্তৃক টিকলী হরণের সে প্রথাও নাই।

বুলবুল ভারতবর্ষের এক সুবৃহৎ পক্ষিসম্প্রদায়। বিভিন্ন প্রকারের বুলবুল হইবে তিপ্পান্ন রকমের। দেশভেদে বর্ণতারতম্য থাকিলেও ইহাদের কয়েকটি কুলগত সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে পরিলক্ষিত হয়। প্রথম, ইহাদের মস্তকের রোমগুলির দৈর্ঘ্য। কোনও কোনও পাখীর মস্তকের এই রোমগুলি দীর্ঘ হইয়া বেশ সু-উচ্চ ঝুঁটির আকার প্রাপ্ত হয়। কতকগুলির মাথার লোমগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, একটু উঁচু হইয়া থাকে, কিন্তু পাখী উত্তেজিত হইলে ঝুঁটির মত খাড়া হইয়া উঠে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইতেছে নিম্ন অঙ্গের যে স্থানে উদর শেষ হইয়া পুচ্ছ আরম্ভ হয়, সেই স্থানের বর্ণে। এই স্থানকে বস্তিপ্রদেশ বলিতে পারি। বাংলাদেশে আমরা সচরাচর যে দুই জাতীয় বুলবুল দেখি তাহাদের উভয়েরই বস্তিপ্রদেশ টকটকে লাল। উত্তর বাংলায়, কুচবিহার ও আলীপুর দুয়ার অঞ্চলে যে বুলবুল দেখা যায় সেগুলির বস্তিপ্রদেশ কমলালেবুর মত বর্ণযুক্ত। নূতন সংস্করণ "ফনা অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া"তে ইহাদের এই দুইটি কুলগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে।

আমাদের দেশে যত্রতত্র যে দুইটি বুলবুল দেখা যায় তাদের একটি হইতেছে "কালো বুলবুল"। ইহাকেই পোষমানানো হয় এবং দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত করা হয়। এই বুলবুলটির মাথা, গলা, বক্ষ ও লেজ কালো, পৃষ্ঠ কালচে বাদামী, পেট এবং পৃষ্ঠদেশের শেষাংশ পুচ্ছমূল, শুভ্র। পৃষ্ঠান্তের এই শুভ্র স্থানটি বেশ সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই বুলবুলটি চড়াই পাখীর আকার, গোলগাল এবং ধরণ ধারণে বেশ সজীব চঞ্চলতা থাকিলেও চপলতা নাই। অন্য বুলবুলটিকে কানাড়া

বুলবুল কিংবা সিপাহী বুলবুল বলা হয়। এর মাথার দীর্ঘ রোমগুলি খাড়া হইয়া মাথায় কিরীটের মত শোভা পায়। ইহার দুই গণ্ডের দুইপাশের একটু স্থান উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং কাণপট্টির আশপাশ শুভ্র। কালো বুলবুল অপেক্ষা ইহাদের গড়ন একটু ছিপছিপে। কালো বুলবুল অপেক্ষা ক্ষিপ্রতা, চঞ্চলতা ইহাদের বেশী। চেহারার মধ্যে বেশ একটা ডোণ্টোকেয়ার ভাব থাকার জন্য এর "সিপাহী বুলবুল" নাম সার্থক হইয়া থাকিলেও—ইহার মেজাজ কালো বুলবুলের মত উগ্র নহে।

এই উভয়বিধ বুলবুলই আমাদের পল্লীঅঞ্চলে একই স্থানে বিচরণ করে। দুই জাতীয় পাখীর মধ্যে কলহ বিবাদ লক্ষ্য করা যায় না। একই জাতীয় পাখীরাও নির্ব্বিবাদে বাস করে। পরস্পরের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় না বটে, কিন্তু ঝগড়াঝাঁটিও দেখা যায় না। বৈশাখ হইতে এরা জোড়ায় জোড়ায় থাকে প্রায় ভাদ্র আশ্বিন পর্য্যন্ত। কেননা এই সময়টা ইহারা গৃহস্থালী করে। কিন্তু তাই বলিয়া এ সময়েও দোয়েলের মত বাগানের মধ্যে নিজ নিজ বিচরণ ক্ষেত্র ভাগ করিয়া নেয় না। অন্য ঋতুতে ইহারা যে দল বাঁধিয়া একটি নিবাসবৃক্ষে অনেকগুলি পাখী রাত্রি যাপন করে তাহা আমি দেখিয়াছি। গয়া সহরে একদিন শেরঘাটির রাস্তা ধরিয়া পাঁচ ছয় মাইল পদব্রজে ভ্রমণান্তে ফিরিবার সময় সূর্য্যাস্ত হইয়া গেল। পথপার্শ্বে এক স্থানে নাতিবৃহৎ বৃক্ষে ঝাঁকে ঝাঁকে কালো বুলবুল কলরব করিতেছে দেখিলাম। আমি কিছুক্ষণ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিলাম। নিশাযাপনের পূর্ব্বে নিজ নিজ স্থান লইয়া অনেক পাখীই অনেকক্ষণ ধরিয়া কলহ, বিতণ্ডা এমন কি নখর-দ্বন্দ্ব করিয়া থাকে। ইহারাও তাহাই করিতেছিল। প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ করিবার পর যখন অস্তরবির প্রতিফলিত আলোকটুকুও নিভিয়া গিয়া নৈশ অন্ধকারের সূচনা হইল, তখন সকলেই চুপ করিয়া

J.

কালো বুলবুল

নিদ্রার সাধনায় রত হইল। যতক্ষণ আলোক থাকে ততক্ষণই এইরূপ গণ্ডগোল চলে। শালিক চড়ুই প্রভৃতি পাখীও নিশারম্ভে এক বৃক্ষে জড় হইয়া এইরূপ জটলা ও চিৎকার করিয়া থাকে। সুতরাং বুলবুল পাখীকে আমি 'অসামাজিক' পাখী বলিতে পারি না। "ফনা অফ বৃটিশ ইণ্ডিয়া" পুস্তকমালার পাখী-সম্বন্ধীয় খণ্ডগুলির মধ্যে ইহার সম্পাদক লিখিয়াছেন—"দে আর নট গ্রিগেরিয়াস ইন দি ট্রু সেন্স অফ দি ওয়ার্ড"। হইতে পারে ইহারা একটু রগচটা—সামান্য কারণে যুদ্ধং দেহি বলিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু গ্রিগেরিয়াস নহে, একথা মানিতে পারি না। অবশ্য শালিক ও ছাতারে পাখীরা সব সময়েই দলে চলাফেরা করে, আহার অন্বেষণ করে—সুতরাং তাহারা "গ্রিগেরিয়াস ইন দি ট্রু সেন্স অফ দি ওয়ার্ড"। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও পরস্পর মারামারি কম হয় না।

নিদাঘকালে এরা সন্তান-উৎপাদন করে। গাছের অপেক্ষাকৃত ছোট সরু ডালের মধ্যে বাটির মত বাসা নির্ম্মাণ করে। একবার এক জোড়া সিপাহী বুলবুল আমার বাড়ীর মধ্যে উঠানের দিকে বারান্দার সিঁড়ির ধারে ছোট একটি ক্রোটন বৃক্ষে বাসা করে। ডিম পাড়িবার পর একটি বিড়ালের উৎপাতে বাসাটি নষ্ট হয়। পুনরায় সেই খানেই বাসা নির্ম্মাণের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু গৃহের বালক বালিকাদের নজরটা একটু অধিক হইয়া পড়ায় সেস্থান পরিত্যাগ করে। এক একটা প্রজনন-ঋতুতে অন্ততঃপক্ষে চারবার ডিম পাড়ে। প্রকৃতির ব্যবস্থায় সববারেই ইহারা বাচ্চা বাহির করিতে সফলকাম হয় না। কোনও বার ডিম অনুর্বর হয়। কখনও বা সাপ, নেউল কিংবা অন্য পাখী শাবক খাইয়া ফেলে। উভয় জাতীয় বুলবুলই একই রকম ডিম পাড়ে। উহার খোলার রং গোলাপী বা লালচে—তার উপর অসংখ্য লাল বা বাদামী দাগ থাকে।

ইহারা কীটাদি ও ফল উভয়ই আহার করে। মাঝে মাঝে এদের নেশা করিবার ঝোঁক হয়। কেননা ইহাদিগকে তালগাছে বাঁধা হাঁড়ির কাণায় বসিয়া রস চুমুক দিয়া খাইতে দেখা যায়। বট-পাকুড়ের ফল, তুঁতফল, তেলাকুচো, ঘাসের বীজ প্রভৃতি ইহারা খায়। সিপাহী বুলবুলকে মটরশুঁটি প্রভৃতি ক্ষেতের ফল খাইতে দেখা যায়। কিন্তু কালো বুলবুল শস্যের ও ফলাদির অপকারী কীটই বেশী খায়। সুতরাং ইহারা কৃষকের বন্ধু।

কাক

একাধিক সুন্দর ও মনোহর পাখীর বর্ণনার পর এবার এমন একটি অতি-পরিচিত পাখীর কথা বলিব যাহার উপর আমরা নিতান্তই বীতশ্রদ্ধ। শুদ্ধ, সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম 'বায়স'। এমন রাশভারি নাম থাকা সত্ত্বেও, ইহার বদনামই বেশী। কি দেশী, কি বিদেশী, সকলেই এই পাখীর সম্বন্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। কাকও আমাদের বিদ্বেষ কড়ায় গণ্ডায় ফিরাইয়া দেয়। ইহার লুণ্ঠনপরায়ণতা, চৌর্য্য, লোভ ও কপটতার দৌরাত্ম্যে আমরা সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকি। আমি এহেন পাখীর পক্ষ সমর্থন করিয়া কিছু বলিব।

নিদাঘের অবসরদিনে গৃহমধ্যে বৈদ্যুতিক পাখীর অভাবে তালবৃন্ত দ্বারা উত্তাপ তাড়াইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া ক্লান্ত গলদঘর্ম্ম পাঠক নিদ্রাদেবীর সুখক্রোড়ে আশ্রয় লাভ সম্বন্ধে যখন হতাশ হইয়া পড়েন, তখন বারান্দার রেলিং হইতে যে সুঠাম, সুগঠিত-দেহ, ভ্রমরকৃষ্ণ পাখিটি মাথা নাড়িয়া প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ জ্ঞাপন করে, তাহার কণ্ঠধ্বনি সম্বন্ধে নিদ্রা-প্রয়াসী পাঠকের অভিমত লিপিবদ্ধ করা হয়তো সুরুচিসঙ্গত হইবে না। যে সমস্ত সুগৃহিনী পাঠিকা কচি আম, বদরী প্রভৃতি অম্লরসাত্মক ফলের বিবিধ রসাল আচার প্রস্তুত করিতে নিপুণা, তাঁহারাও এই বিহঙ্গটিকে সুনজরে দেখেন না। যাঁহাদের কটাক্ষবর্ষণে ত্রিভুবন চঞ্চল, তাঁহাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিকে এ পাখী নিতান্তই অবজ্ঞা করে—দুষ্ট পাখী পালটিয়া গালি দেয়—"কা—কা—কাণা হও—কাণা হও।"

অতি শৈশবেই আমরা কাকের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইতে শিখি। ভেতো বাঙ্গালীর বাচ্চা যখন ভাত খাইতে বিদ্রোহ করে, তখন

তাহার জননী ভগিনী তাহাকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিয়া কাককে আহ্বানপূর্ব্বক, সে লইয়া যাইবে এই ভয় দেখাইয়া অন্ন গলাধঃকরণ করান। যতই বয়স বাড়িতে থাকে পাখিটির চৌর্য্যকুশলতায় ততই বিরক্ত হইতে থাকি। সহরের বালক যখন অনেক কান্নাকাটি-লব্ধ পয়সার বিনিময়ে ঠোঙাভরা রসমুণ্ডি লইয়া উৎসাহে গৃহপানে ধাবিত হয়, তখন এই খেচর সহসা ছোঁ মারিয়া বালকের সব আনন্দ উৎসাহ ধূলিসাৎ করিয়া দেয়।

আমাদের এই অতি-পরিচিত নিত্য সহচর পাখীকে আমরা যে শুধু ঘৃণা করি তাহা নহে, জগতের সৃষ্টিপ্রকরণে ইহাকে একটা অনাবশ্যক অত্যুক্তি বলিয়া বিবেচনা করি। এবং "যাকে দেখতে পারি না তার চলন বাঁকা" এই হিসাবে কাকের কণ্ঠ-ধ্বনিতে ভাবি অমঙ্গলের আশঙ্কা আরোপ করি।

তাচ্ছিল্য, ঘৃণা ও অনবরত তাড়নায় পাখী দূরে থাক, সহজ মানুষই ধূর্ত্ত ও চোর হইয়া উঠে। বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের সহিত যুঝিয়া তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হয় বলিয়া কাক চোর, লোভী, ধূর্ত্ত, দুর্ম্মুখ। শুধু এই সকল দোষের জন্য কাককে পক্ষিসমাজের চণ্ডাল রূপে নির্দ্দেশ করা উচিত হইবে না। বিহঙ্গ পিনালকোডে চৌর্য্য আদৌ অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে। বিশেষতঃ মানুষের সম্পত্তি অপহরণ করা পক্ষি সমাজে প্রশংসার কার্য্য। যেমন অনেক পাশ্চাত্য জাতির বিশ্বাস যে তাঁহাদের সুবিধার্থেই প্রাচ্য জগতের সৃষ্টি, নহিলে প্রাচ্য দেশবাসীর অস্তিত্বের কোনও ন্যায্য কারণ থাকে না—তেমনি পশুপক্ষিগণের মধ্যে বহু দার্শনিক মনে করে যে মানুষ তাহাদেরই সুবিধার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই সুবিধাগুলি আদায় করিতে গেলে চতুরতা এবং চৌর্য্য অবলম্বন করিতেই হইবে।

কাককে আমরা অবজ্ঞা ও অবহেলা করি বলিয়া ইহার জীবনের

ও চরিত্রের বিশেষত্বগুলি আমাদের লক্ষীভূত হয় না। কাক যে মোটেই হেয় জীব নহে তাহা তাহার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। সামাজিক বাঁধাবাঁধির অভাব সত্ত্বেও

কাক

কাক-দম্পতির একজনের মৃত্যু না হইলে কেহ কাহাকেও ত্যাগ করে না—এবং কাকের দীর্ঘ জীবন সর্ব্বজনবিদিত। পরস্পরের যে ভাবে

ইহারা চঞ্চুদ্বারা গাত্র কণ্ডুয়ন করে, তাহাতে ইহাদের উভয়ের প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কাক তাহার সঙ্গিনীর বিশেষ যত্ন লইয়া থাকে। কাকগৃহিনীর প্রসূতি অবস্থায় পুরুষ কাক তাহার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সযত্নে খাওয়ায়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে স্ত্রী কাক পুরুষ কাকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াও কোনও শাস্তি পায় নাই। আহার্য্য সম্বন্ধে এরূপ ঔদার্য্য পশুপক্ষীর মধ্যে বিরল।

কাক অত্যন্ত সন্তানবৎসল। সন্তানদের বিপদ আশঙ্কা করিলে সে মানুষকে আক্রমণ করিতেও পশ্চাদপদ হয় না। চতুর কাককে ধূর্ত্ততর কোকিল প্রতারিত করিয়া নিজ বাচ্চা পালন করাইয়া লয়। এই পালিত শাবকগুলির ক্ষুধা হয় অপরিসীম। কিন্তু অসীম ধৈর্য্যসহকারে শাবকগুলির অপূরণীয় ক্ষুধা মিটাইতে ইহারা একটুও বিরক্ত হয় না। মানুষ পিতামাতাও সন্তানের এত আব্দার সহ্য করেন না। এই শাবকগুলির আহার্য্য আহরণ করিয়া আনিবার "তর সয়না"। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি একবার খাওয়াইয়া আহার্য্য অন্বেষণে কাকগুলি চলিয়া যাওয়া মাত্র কোকিলশাবক ভীষণ আর্ত্তনাদ জুড়িয়া দেয়। কাক নীরবে সকল বিরক্তি উপেক্ষা করিয়া সন্তানের সেবা করিয়া যায়। কোকিল শিশুর চাহিদা মিটাইতে এত শীঘ্র শীঘ্র উহাদের খাবার লইয়া ফিরিতে হয় যে নিজেরা বোধ হয় খাইবার সময় পায় না—দিবসের বেশীর ভাগ সময় অনাহারে থাকে। পক্ষিসমাজে খুব কম পাখী, শাবক কুলায় পরিত্যাগ করিয়া বাহির হওয়ার পর, শাবক উড়িতে সক্ষম হইলে শাবককে নিজে খাওইয়া দেয়। কিন্তু কাক, বাচ্চা বড় হইয়া বেশ উড়িতে পারিলেও, বাচ্চাগুলিকে খাওয়াইয়া দিয়া থাকে।

সামাজিক জীবনে কাকের একতা খুব বেশী। দলাদলি একরূপ নাই বলিলেই চলে। সাধারণতঃ পাখীদের মধ্যে পংক্তিভোজন কম। কিন্তু কলিকাতার পথে আবর্জ্জনারাশি ঘিরিয়া কাকের দল নির্ব্বিবাদে

আহার করে। ব্যক্তিগত বিবাদ ও দ্বন্দ্বযুদ্ধ মাঝে মাঝে হয় বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত কলহ সামাজিক দলাদলিতে পরিণত হয় না।

মাঝে মাঝে কনফারেন্স আহ্বান করিয়া সামাজিক আলোচনা ইহারা করে। আমাদের পাশের বাড়ীর একটা নিমগাছে প্রায়ই কাকের পঞ্চায়েৎ বসিত। কেহ যে সভাপতি হইত তাহা মনে হয় না। কেহ গাছে, কেহ বা তন্নিয়ে ছাদের উপর বসিত। এবং যাহাদের কিছু বক্তব্য থাকিত তাহারা শাখাগ্রে উড়িয়া গিয়া বসিয়া বক্তৃতা দিত এবং বক্তব্য শেষ হইলে নামিয়া আবার ছাদে আসিয়া বসিত। এইরূপে ২০-৩০ মিনিট বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ করিয়া যে যাহার কাজে চলিয়া যাইত। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে নিবাসবৃক্ষে যাইবার পূর্ব্বে কাক একবার "কাক স্নান" করিয়া লয়। নদীর কূলে বা অন্য কোনও জলাশয়তীরে একদল কাক গিয়া উপবেশন করে তারপর অতি ধীর পদক্ষেপে জলের নিকট যাইয়া মস্তকটি জলমধ্যে ক্ষিপ্রভাবে প্রবেশ করাইয়া পৃষ্ঠোপরি কিছু জল ছিটাইয়াই সরিয়া আসে তাবপর চঞ্চুদ্বারা পালকগুলি পরিষ্কার করিয়া লয়। বহুবার তাহারা এইরূপ করে। তাহার পর সকলে মিলিয়া কোনও একটি উচ্চবৃক্ষে আশ্রয় লয়। কিছুক্ষণ রাত্রিবাসের স্থান লইয়া খুব খানিকটা কলহ বিতণ্ডা ঠেলাঠেলির পর সকলে নীরব হয়।

পরস্পরের আপদে বিপদে কাকের সহানুভূতি খুব বেশী। কোনও কাকের অনিষ্টচেষ্টা করিলে, আশে পাশের সমস্ত কাক জড়ো হইয়া এমন অ্যাজিটেশন সুরু করিবে যে হয় আপনাকে অনিষ্ট চেষ্টা হইতে বিরত হইতে হইবে, নয় বিলাতি পদ্ধতি দ্বারা উহা ঠাণ্ডা করিতে হইবে। ছোটনাগপুরের প্রান্তিক একটি সহরে বাসকালে ঔদরিকভাবে পক্ষী-তত্ত্বের গবেষণার্থ প্রায়ই বন্দুকস্কন্ধে পক্ষী সংগ্রহে বাহির হইতাম। বাসার অদূরে একটী পলাশবন দিয়া যাইবার সময় কখনও কখনও কাকের নজরে পড়িয়া যাইতাম। আমাকে দেখিলেই কলরব সুরু

হইত এবং আশেপাশে যত কাক থাকিত সকলেই ছুটীয়া আসিয়া আমাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি সুরু করিত। আমি যতই অগ্রসর হইতাম তাহারা সামনের দিকে যথেষ্ট দূরত্ব রক্ষা করিয়া চিৎকার করিতে করিতে ফেউয়ের মত সঙ্গ লইত। ফলে সে তল্লাটের খেচর-পলায়ন করিত। কাক বন্দুক জিনিষটীর ব্যবহার বেশ জানে। যতক্ষণ হাতে বা কাঁধের উপর বন্দুক থাকিত ততক্ষণ তারা আমার কাছাকাছি হাত ৩০-৪০ দূরে দূরে চলিত। যদি নিশানা করিবার জন্য বন্দুক উঠাইয়াছি, অমনি যে যেখানে থাকিত ভোঁ দৌড়। কিন্তু বন্দুকের হননক্ষমতা যে সসীম দূরত্বের উপর নির্ভর করে সে তথ্যটী যেন ইহারা জানে—তাই যথোচিত দূরে সরিয়া গিয়াই বিদ্রূপ ও গালি দিতে আরম্ভ করে। তুমি ছড়ি লইয়া বেড়াও, কাক তোমাকে গ্রাহ্য করিবে না। কিন্তু একটী ঢিল কুড়াইয়া লওয়া মাত্র সে চম্পট দিবে। কাক বড় উপদ্রব করিতেছে, তুমি একটী গুলতি বাঁশ লইয়া ঘর হইতে বাহিরে আইস,—তোমাকে দেখিবামাত্র কাকের হঠাৎ মনে পড়িয়া যাইবে যেন ওপাড়ায় তাহার একটা নিমন্ত্রণ আছে।

কাক আমাদের ধাঙ্গড়ের কাজ করে একথা নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। আমাদের মিউনিসিপালিটী ও কলিকাতা কর্পোরেশনে স্বায়ত্ত-শাসনের ঠেলায় রাস্তাঘাটে মৃত মূষিক বিড়ালাদি পড়িয়া পচিতে থাকে। কাকের কল্যাণে গলিবাসী নির্জীব বাঙ্গালী কিছুটা স্বস্তি পায়।

গবাদি পশুর সঙ্গে কাকের খুবই সম্প্রীতি। এইসব বিশালকায় চতুষ্পদের পদতাড়নায় শষ্প মধ্য হইতে অনেক কীটপতঙ্গ স্থানচ্যুত হয়। এইসকল কীটাদির লোভে কাককে উহাদের সঙ্গে হাঁটিতে দেখা যায়। আবার গরু যখন বসিয়া জাবর কাটে, কাক তখন তাহার নাসিকামধ্য, পৃষ্ঠ বা পুচ্ছ হইতে, কর্ণ বা চক্ষুর কোণ হইতে এঁটুলি পোকা ঠোকরাইয়া তুলিয়া লয়। গরু ইহাতে আরাম পায়। মুখাগ্রে কাককে

আসিয়া উপবেশন করিতে দেখিলেই, গরু, বলদ বা মহিষ তাহার দিকে মুখ বাড়াইয়া দিয়া নিমীলিত নয়নে অপেক্ষা করে, কাক ইঙ্গিত বুঝিয়া ঐ চতুষ্পদের নাসারন্ধ্রে নিজ চঞ্চু প্রবেশ করাইয়া দেয়—এরূপ দৃশ্য অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইহা শুধু যে গোসেবা-পরায়ণ, তাহা নহে। ইহা কৃষকের মিত্র। পঙ্গপালের ঝাঁক যখন কৃষকের হৃৎকম্প আনয়ন করে, তখন শালিক প্রভৃতি পাখীর সঙ্গে কাকও সেই পঙ্গপালচমূ আক্রমণপূর্ব্বক তাহা বিধ্বস্ত করিতে তৎপর হয়, এ কথা বিশেষজ্ঞ লক্ষ্য করিয়াছেন।

কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও খেচরসমাজে কাকের যথেষ্ট অপযশ আছে এবং সে জন্য ইহাদিগকে বেশ উপদ্রুত হইতে হয়। পক্ষিডিম্বের ও পক্ষিশাবকের সুকোমল মাংসের লোভ কাক সম্বরণ করিতে পারে না। সেই জন্য ইহাকে সকলেই সন্দেহের চোখে দেখে। পক্ষীসমাজের বড় দারোগা, ফিঙ্গে, কাক দেখিলেই আক্রমণ করে। কাক, ফিঙ্গে অপেক্ষা আয়তনে বড় হইলেও, কাপুরুষ। ফিঙ্গের সামনে পড়িলে সে পলাইবার পথ পায় না। এমন কি শালিক পাখীর কাছেও অপমানিত হইয়া সরিয়া পড়িতে ইহাকে দেখা যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদিও ক্ষুদ্রতর ফিঙ্গে ও শালিকের সহিত কাক আঁটিয়া উঠিতে পারে না, উহাপেক্ষা বৃহত্তর ও অধিকতর শক্তিশালী চিল কাকের নিকট জব্দ থাকে। দুইটি কাক মিলিয়া চিলের নিকট হইতে প্রায়ই খাদ্য কাড়িয়া লইয়া যায় এবং আকাশপথে চিলকে নিকট দিয়া যাইতে দেখিলেই কি জানি কেন তাহাকে তাড়া করিবার ইচ্ছা কাকের মনে জাগ্রত হয়। চিল বলশালী পাখী হইলেও কাককে এড়াইয়া পলায়ন করাই সঙ্গত মনে করে। পক্ষীতত্ত্বের লেখক ডগলাস ডেওয়ার সাহেব একদল কাক কর্ত্তৃক চিলের বাসা আক্রমণপূর্ব্বক তাহাকে আহত বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়ার এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়াছেন।

আমাদের দেশে দুই প্রকারের কাক দেখিতে পাই। একটি হইল দাঁড়কাক। ইহা আকারে অপেক্ষাকৃত বড় এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ—কালোর উপর ঘন নীলের একটু আভা রৌদ্র পড়িলে লক্ষিত হয়। ছোট কাকটির গলা ঘাড ও ডানা পর্য্যন্ত পিঠের উপরাংশ ধূসর—বাকী শরীরটা ঘন কৃষ্ণ। ইহাকে কোন কোন অঞ্চলে পাতিকাক বলে। উপরে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। তবে দাঁড়কাক বেশী রাশভারী এবং অতিশয় জনসমাগম পছন্দ করে না। সেইজন্য বড় সহরে তাকে দেখা যায় কচিৎ। পল্লী-অঞ্চলেই ইহা থাকিতে ভালবাসে। বোধহয় এই কারণেই ইংরেজ লেখকরা ইহাকে "জাঙ্গল ক্রো" নামে অভিহিত করেন এবং পাতি-কাককে "হাউস ক্রো" বলিয়া বর্ণনা করেন।

কাকের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডির বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। কাক নির্ব্বিঘ্নে নিজ শাবকোৎপাদন করিতে পায় না, প্রায়ই তাহার নিজের ডিম্ব বিনষ্ট হয় কিংবা শাবক অকালে নিহত হয়—এই নৃশংস কার্য্যটি করে কোকিল। আমাদের ও সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদের অতিপ্রিয় বসন্তসহচর কোকিল, পূরাদস্তুরের বোহেমিয়ান—নিজ সন্তান সে কাক দিয়া পালন করাইয়া লয়। সুচতুর কাক বুঝিতে পারে না যে সে পরের সন্তান "মানুষ" করিতেছে। কোকিলের প্রতি কাকের একটা সহজাত বিদ্বেষ আছে—কোকিল দেখিলে সে তাড়া করিবেই এবং ধরিতে পারিলে কোকিলের ত্রাণ থাকে না। কিন্তু প্রকৃতির বিধানে কোকিল কাক অপেক্ষা দ্রুত উড়িতে পারে সুতরাং কাক তাহাকে কখনও ধরিতে পারে না। কিন্তু এই তাড়া করার প্রবৃত্তিটার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে কোকিল।

দাঁড়কাক বসন্তের প্রারম্ভ হইতেই নীড় রচনা কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। নিদাঘের মাঝামাঝি এই কার্য্য আরম্ভ করিয়া বর্ষাকাল পর্য্যন্ত পাতি-

কাকের প্রজননকাল। এই উভয়বিধ কাকের বাসাতেই কোকিল তার ডিম্ব রক্ষা করে। কাকের বাসা গাছের উচ্চ ডালে বা শাখাগ্রে মুক্ত স্থানে স্থাপিত হয়। বড় বড় সহরে যত্রতত্র বাসা বাঁধে। বড় বড় কাঠি যেনতেন রাখিয়া একটা বাসা তৈরী হয়। তবে তার ভিতরের আস্তরনের জন্য, হয় ঘোড়া বা অন্য পশুর লোম বা মানুষের চুল ব্যবহৃত হয়। কাক ডিম পাড়িবার পর বাসা খালি রাখিয়া কোথাও যায় না। স্ত্রী পাখীর ক্ষুধা পাইলে পুরুষ পাখী ডিমের উপর উপবেশন করিয়া থাকে। কাকের ৩।৪টি ডিম পাড়িবার পর স্ত্রী কোকিলেরও ডিম পাড়িবার বোধহয় সময় আসে। এই সময় পুরুষ কোকিলটি কাকের বাসার খুব নিকটে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কুহুতান জুড়িয়া দেয়। কোকিল দেখিয়াই কাকদম্পতি সব সাবধানতা ভুলিয়া যায় ও কোকিলকে তাড়া করে। দ্রুতগামী পাখী হওয়া সত্ত্বেও কোকিল কাকের সামনে অল্প একটু আগাইয়া উড়িয়া চলে, কাকদম্পতি ধরি ধরি করিতে করিতে কোকিলের পিছন পিছন বহুদূর আসিয়া পড়ে। ইত্যবসরে স্ত্রীকোকিল কাকের বাসায় নিজ ডিম্ব রক্ষার কার্য্য সমাধা করিয়া তারস্বরে শব্দ করে। স্ত্রীকোকিলের সঙ্কেতধ্বনি শোনামাত্র কোকিল নিজ গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া পশ্চাদ্ধাবমান কাকদম্পতিকে সহজে পিছনে ফেলিয়া ঘন বৃক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। কোকিল নিজ ডিম অন্যত্র পাড়িয়া চঞ্চুতে করিয়া কাকের বাসায় রাখিয়া আসে, এইরূপই অনেকের ধারণা। শুনিতে পাই স্ত্রীকোকিল নিজ ডিম কাকের বাসায় রাখিবার পূর্ব্বে কাকের ডিমগুলিকে পদতাড়নায় নীচে ফেলিয়া দেয়। একথা শুনা যায় যে অনেক সময় কোকিল ডিম রাখিতে গিয়া কাকের নীড় মধ্যে সদ্য-প্রস্ফুটিত কাকের বাচ্চা পাইলে তাহাকে ঠেলিয়া বৃক্ষনিম্নে ফেলিয়া দেয়। এ সম্বন্ধে আমার নিজ অভিজ্ঞতা নাই, পাঠক-পাঠিকাকে, সময় ও সুযোগ অনুসারে লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি।

কোকিল

আমরা বাংলাদেশে যেদিন সরস্বতী পূজা করি, বাংলার বাহিরে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য স্থানে সেদিন "বসন্ত-পঞ্চমী" উদযাপিত হয়। এই দিন বসন্তোৎসবের আরম্ভ হয়, যাহার শেষ হয় ফাল্গুন পূর্ণিমায় হোলির দিন। বাঙ্গালীরা হঠাৎ এদিনটাকে সরস্বতীপূজার জন্য কেন ধার্য্য করিয়াছেন তাহা গবেষণার বিষয়। বাস্তবিকপক্ষে ঐ দিবস হইতেই আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন বেশ বোধগম্য হয়। শীতের তীক্ষ্ণতা চলিয়া গিয়া বাতাসে একটা হাল্কা ঝিরঝিরে ভাব অনুভূত হয়—অর্থাৎ দখিনা বাতাস মাঝে মাঝে আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করে। কোকিলের রুদ্ধকণ্ঠকে সহসা মুক্তি দিয়া প্রকৃতিও ইহার ইঙ্গিত দেয়। বর্ষাকাল হইতেই কোকিলের ডাক শোনা যায় না। শোনা গেলেও তার তীব্রতা, মাধুর্য্য ও উচ্ছ্বাস থাকে না। শীতকালে কোকিলের কণ্ঠরব একান্ত নীরব থাকে। মনে হয় কোকিল বুঝি দেশের কোথাও নাই। কিন্তু বসন্ত-পঞ্চমী দিবসে (আমাদের সরস্বতী পূজা) বা তার ২।৪দিন অগ্রপশ্চাতে কোকিলের উচ্চ কুহুতান সহসা বনানী প্রকম্পিত করিয়া তোলে। ১৯২৫ সালে প্রথম আমি সরস্বতী পূজার দিন কোকিলের কণ্ঠস্বর শুনিয়া—ইহাকে সত্যসত্যই বসন্তের বার্ত্তাবহ বলিয়া বুঝিতে পারি। তারপর বহুবৎসর ধরিয়া আমি বসন্ত-পঞ্চমী দিবসের কয়েকটা দিন সর্ব্বদা উৎকর্ণ হইয়া থাকিতাম, এবং ঐ দিবসের ২।১দিন পূর্ব্বে বা পরে কোকিলের প্রথম কলধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি। কোকিল যে বসন্তের বার্ত্তাবহ ইহা শুধু কবির কল্পনা নয়—প্রাকৃতিক সত্য।

কোকিলের জীবনকাহিনীর দ্বারা পক্ষিতত্ত্বের কয়েকটি রহস্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া কিরূপে

নিজ সন্তান উৎপাদন করায় সে কথা "কাক" প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। আবার শীতকালে যার অস্তিত্ব বুঝা যায় না সে পাখী সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে, সে তাহলে কি এ দেশে থাকে না? অথবা তার কণ্ঠনালী শীতের

কোকিল

সময় এমন আড়ষ্ট হইয়া যায় যে সে শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না? অনেকে বলেন যে কোকিল ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেই অপেক্ষাকৃত কম

শীতের দেশে শীতকালটা কাটায়। অর্থাৎ ইহা আংশিক যাযাবর।

যাযাবরত্ব পক্ষি-জীবনের একটা প্রকাণ্ড রহস্য এবং ভারতবর্ষের পাখীদের যাযাবর জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হয় নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। যে সমস্ত পাখী একদেশে প্রজনন ঋতু কাটায় এবং অন্য ঋতুতে শতসহস্র মাইল দূরে গিয়া শীতের কয়েকটা মাস থাকে, তাহাদেরই যাযাবর বলে। কি ভাবে, কোন পথে, কোন দেশে পাখী যায়—ইহা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। আমাদের দেশে এই সব জানিবার কৌতূহল কয়জনের আছে?

যাযাবর পাখীদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। (১) কতকগুলি পাখী ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালে শাবকোৎদন করিতে চায় না। তাহারা সুদূর সাইবেরিয়া বা নিকটবর্ত্তী দেশে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় শাবকদের জনন ও পালন করিয়া লয় এবং শীত পড়িতে আরম্ভ করিলেই সেখান হইতে চলিয়া আসে। ইহারাই আসল যাযাবর অর্থাৎ ট্রু মাইগ্র্যাণ্ট। (২) আর একদল হিমালয়ের বায়ুই যথেষ্ট শীতল মনে করে এবং গ্রীষ্মকালে হিমালয়ের জঙ্গল প্রদেশে গিয়া শাবকোৎপাদন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। ইহাদিগকে স্রেফ মাইগ্র্যাণ্ট বা যাযাবর বলা হয়। (৩) যে সব পাখী ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যায় না, কাশ্মীর হইতে লঙ্কাদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডেই ঋতুবিশেষে বাস করে, তাহাদিগকে আংশিক যাযাবর বা পারসিয়েল মাইগ্র্যাণ্ট বলা হয়: বাংলায় "আভ্যন্তরিক যাযাবর" বলা হয়তো অসঙ্গত হইবে না। কোকিলকে এই শেষোক্ত শ্রেণীর যাযাবর বলা যায়। তবে এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা চলে কিনা আমার সন্দেহ আছে। বোম্বে ন্যাচুরেল হিষ্ট্রি সোসাইটি কোকিল ও পাপিয়াকে আভ্যন্তরিক যাযাবর শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। তবে বাংলা দেশের কোকিল আদৌ দেশ ছাড়িয়া যায় কিনা সন্দেহ। দক্ষিণবঙ্গে আমি

পৃঃ

হলুদে পাখী

শীতকালে কোকিলকে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি। উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে যদি কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকেন, আমাকে জানাইলে বাধিত হইব।

এ বিষয়ে আমার ধারণা এই যে কোকিল শৈত্যের আধিক্য সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্য উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে শীত অত্যন্ত তীব্র হয় বলিয়া কোকিল ঐ সময় সেখান হইতে দক্ষিণে ও পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডার দেশে চলিয়া আসে। দক্ষিণ বঙ্গের শীতে মোটেই তীব্রতা নাই, সুতরাং এ অঞ্চল ছাড়িয়া যাইবার প্রয়োজনীয়তা সে বোধ করে না। আমাদের দেশের পরিচিত কোকিলদের মধ্যে "শাহী বুলবুল" (পরে বর্ণনা আছে) একমাত্র যাযাবর বা মাইগ্র্যাণ্ট কেন না ইহা হিমালয়ে থাকে এবং শুধু বর্ষাকালেই এ দেশে চলিয়া আসে।

আমরা যাকে কোকিল বলি সে পাখী কিন্তু মোটেই ইংরেজদের 'কুক্কু' নহে। ইংরেজ লেখকরা সেইজন্য এই পাখীকে তাঁদের কেতাবে কুক্কু বলেন না, হিন্দী "কোয়েল" শব্দই তাঁদের ভাষায় গ্রহণ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক মতে কোকিলের গোষ্ঠি বেশ বৃহৎ এবং বাংলা দেশে এই গোষ্ঠির কোকিল ছাড়া একাধিক পাখী বেশ পরিচিত। ইহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) পাপিয়া—পাখীটি দেখিতে বাজের মত সেইজন্য ইহার ইংরাজী নাম হক-কুক্কু।

(২) "বউ-কথা-কও"—একেই ইংরেজরা "দি ইণ্ডিয়ান কুক্কু" বলেন, কেন না বিজ্ঞানমতে ইহাই ইংরেজের "কুক্কু" পাখীর ভারতীয় সংস্করণ।

(৩) "শাহী-বুলবুল"—ইহার ইংরেজী নাম "দি ইণ্ডিয়ান ক্রেষ্টেড্ কুক্কু"। পশ্চিম ভারতে কোনও কোনও স্থানে ইহাকে "কালা পাপিহা" বলে। ইহার নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে যে

পাপিয়া

ইহার মাথায় ঝুঁটি আছে—কেন না ঝুঁটি থাকিলেই তাকে এদেশে বুলবুল বানাইয়া ছাড়া হয়।

(৪) 'কানাকুয়া'—ইহা কাকের মত দেখিতে ভূমিচর একটি পাখী, দেখিয়া কাকের জ্ঞাতি বলিয়াই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। ইহার ইংরেজী নাম "ক্রো-ফেজ্যাণ্ট"।

পাপিয়া, বউ-কথা-কও ও কানকুয়া বাংলাদেশে বাসিন্দা পাখী, যাযাবর নহে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

এদেশে ছেলেবুড়া সকলেই বোধ হয় কোকিল দেখিয়াছেন, সুতরাং কোকিলের বিশেষ রূপবর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। পুং কোকিল চকচকে নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু দুটি লাল এবং চঞ্চুটি বেশ পুরু ও দৃঢ়। স্ত্রী পাখী কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণের। ইহার শরীরে কৃষ্ণবর্ণ কোথাও নাই। ইহার পালকগুলি ধূসর এবং পতত্রভাগ শ্বেতাভ হওয়ায় মনে হয় ইহার শরীরে অসংখ্য সাদা রঙের ছিটে দেওয়া। অজ্ঞ ব্যক্তি ইহাকে অন্য পাখী মনে করেন, অনেকে ইহাকে "তিলে কোকিল" বলিয়া থাকেন। পূর্ণবয়স্ক কোকিল দৈর্ঘ্যে ১৭ ইঞ্চির কম নহে, কিন্তু পুচ্ছটিই ইহার অর্দ্ধেকের বেশী জুড়িয়া থকে।

পাপিয়াকে দেখিলে হঠাৎ বাজ-পাখী বলিয়া মনে হয়। পালবর্ণ ধূসর, শ্বেতাভ চক্ষু, কণ্ঠ ও মুখের দুইপাশ শ্বেতাভ, স্কন্ধ ও বক্ষ ভষ্মবর্ণ কিঞ্চিৎ লাল আভাযুক্ত, বক্ষের নিম্নাংশ ও উদর শুভ্র রেখাযুক্ত, পুচ্ছের পালকের নিম্নভাগ সাদা এবং উপরে আড়াআড়ি ভাবে ৪।৫টি সাদা রেখা। মোটামুটি ইহাই পাপিয়ার বর্ণনা। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই দেখিতে একরূপ।

বউ-কথা-কও পাপিয়ার সদৃশ। ইহার বর্ণ বাদামী মস্তক ও স্কন্ধদেশ ঘন ছাই রঙের। পুচ্ছের প্রান্তভাগ শুভ্র এবং পুচ্ছের অগ্রভাগের দিকে আড়াআড়ি একটা বেশ চওড়া সাদা রেখা। কণ্ঠ আর বুক

ছাই রঙের ; নিম্নবক্ষ কালো রেখাঙ্কিত শুভ্র। স্ত্রীপাখীটি অনুরূপ, তবে কণ্ঠ ও বক্ষের বর্ণ আর একটু গাঢ়।

শাহী-বুলবুলের দেহের বর্ণ অনেকটা দোয়েলের মত—সাদা কালোর সুদৃশ্য সমাবেশ। ইহার দেহের উপরিভাগ, মায় মস্তকের দীর্ঘ ঝুঁটি, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ এবং নিম্নভাগ শুভ্র। দোয়েলের মতই ইহার ডানার উপর একটা সাদা রেখা আছে এবং পুচ্ছাগ্রভাগও শুভ্র। তবে দোয়েল আঁটসাট দেহ ও আয়তনে ছোট, শাহী-বুলবুল ছিপ্‌ছিপে গড়নে এবং লেজটি দীর্ঘ হওয়ায় দোয়েল অপেক্ষা লম্বায় দীর্ঘতর। কলিকাতার উপকণ্ঠে বর্ষাকালে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

কোকিল-গোষ্ঠির সব পাখিদের বিশেষত্ব এই, যে ইহারা উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতে পছন্দ করে না। আম, লিচু, বকুল, শিরীষ, নিম, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি ঘন পল্লব-বিশিষ্ট উচ্চ বৃক্ষের শাখামধ্যে আত্মগোপন করিয়া বেড়ানই ইহাদের অভ্যাস। এক গাছ হইতে অন্য গাছে যাইতে হইলে খুব দূর পাল্লার দৌড় ইহারা দেয় না। পরের ঘরে চুরী করা যাহাদের অভ্যাস তাহারা অপরাধীর মতই ফেরে। কাক, ছাতারে প্রভৃতি পাখী ইহাদের দেখিলেই ইহাদের পিছনে লাগে, সুতরাং আত্মগোপনশীলতা ইহাদের আত্মরক্ষার জন্যই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।

অন্য পাখীর বাসায় ইহাদের শৈশব কাটে বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদিগকে "পরভৃত" "অন্যপুষ্ট" প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কোকিল কাকের "পরভৃত"। পাপিয়া ও শাহী-বুলবুল ছাতারে পাখীর বাসায় নিজ সন্তান পালন করায়। বউ-কথা-কউ পাখীর সম্বন্ধে আমি নিজে কিছু জানিনা। ইহারা নাকি হিমালয়ের কয়েকটি ক্ষুদ্র পাখীকে প্রতারণা করিয়া এ কার্য্য করাইয়া লয়। কোকিল-গোষ্ঠিতে এমন পাখীও অবশ্য আছে যাহারা পরভৃত
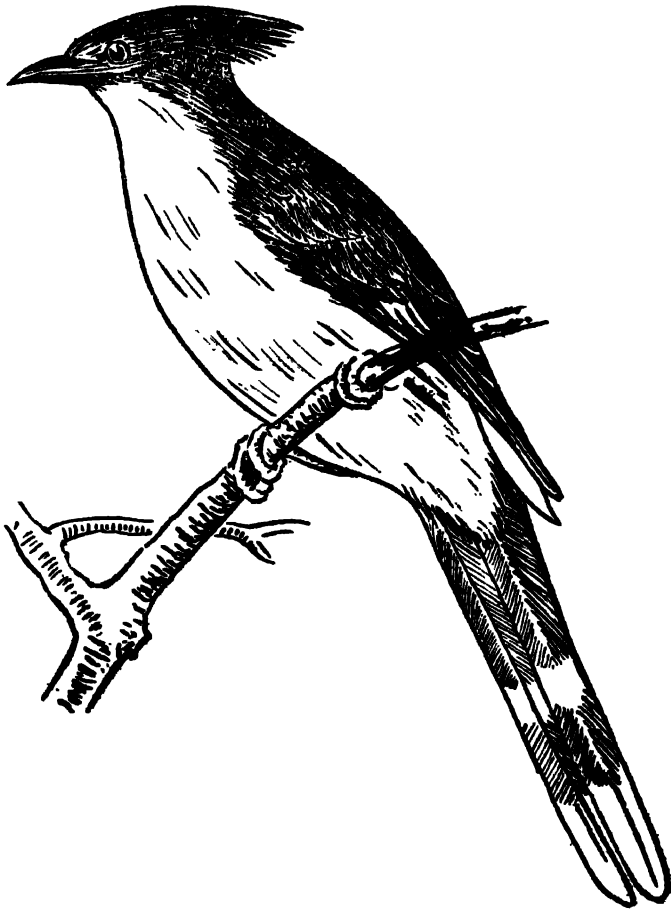
শাহী-বুলবুল

নহে। পরিচিত পাখীদের মধ্যে কাণাকুয়া সেইরূপ। ইহারা নিজ নীড় রচনা করিয়া নিজেরাই শাবক লালন পালন করে।

"বউ-কথা-কও"

"কাণাকুয়া"—আমাদের দেশে যেমন কোনও পাখীর মাথায় ঝুঁটি থাকিলেই চলতি ভাষায় আমরা তাকে "বুলবুল" আখ্যা দিয়া থাকি, ইংরেজরাও তেমনি কোনও পাখীর সুদীর্ঘ প্রলম্বিত পুচ্ছ থাকিলে তাহাকে ফেজ্যাণ্ট আখ্যা দেয়। সেইজন্য কাকের মত দেখিতে এই পাখীটিকে ইংরেজেরা "ক্রো-ফেজ্যাণ্ট" নামে অভিহিত

করে। ইহাকে দেখিলে কোকিলের সহিত ইহার যে কোনও সম্পর্ক আছে তাহা বুঝা শক্ত। ইহারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট, একটি দাঁড়কাকের মত আয়তন। পুচ্ছের অগ্রভাগ বেশ চওড়া এবং এই সুদীর্ঘ পুচ্ছটির জন্য দাঁড়কাক অপেক্ষাও ইহাকে বড় দেখায়। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ ঘন কালো, শুধু ডানাদ্বয় ঘন বাদামী বর্ণের। চক্ষু উজ্জ্বল লাল, কোকিলের মত। ইহারা ভিজা স্যাঁতসেঁতে জমিতে ধীর পদক্ষেপে বিচরণ করিয়া কীটাদি সংগ্রহ করে। প্রায়ই ইহাদের জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী ঘন ঝোপের নিকটই মাটির উপর দেখা যায়। অবশ্য বাগানে ও ডালে ডালে এরা থাকে, তবে খুব উচ্চ ডালে যায় না। নিম্ন শাখা মধ্যেই এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমনাগমন করে। সারাদিনই মাঝে মাঝে 'গুপ্-গুপ্' এইরূপ একটা গম্ভীর শব্দ করে। জোড়ায় জোড়ায় ইহারা বাস করে এবং দাম্পত্যপ্রেম ইহাদের অত্যন্ত প্রগাঢ়। একটি মারা গেলে আর একটি নাকি অন্য সঙ্গী গ্রহণ করে না। শুনিয়াছি ধনেশপাখীর মাংসের মত ইহাদের মাংস বাতরোগীর পক্ষে ভাল। পশ্চিম অঞ্চলে ইহাকে "মহুকল" বলে। ইহারা সাপের শত্রু। এ কারণে ইহাদের নির্ব্বিবাদে বাস করিতে দেওয়াই সঙ্গত। ইহারাও লোকালয়ের মধ্যেই বাস করিতে ভালবাসে।

কাণাকুয়া ছাড়া এই গোষ্ঠির পাপিয়া, বউ-কথা-কও এবং শাহী-বুলবুল কীটভুক পাখী। ইহারা সকলেই আবার এমন একটা কীট ভক্ষণ করিতে ভালবাসে যাহা অন্য পাখী স্পর্শ করিতেও সাহস পায় না। বর্ষা-শেষে এদেশে বহু শুঁয়া পোকার প্রাদুর্ভাব হয়। অনেক শুঁয়া আবার বাগানের ফলবৃক্ষের পাতা খাইয়া গাছ নষ্ট করে। এই সব শুঁয়া উক্ত কয়প্রকার পাখীর প্রিয় খাদ্য। সুতরাং ইহারা মানুষের হিতকারী।

ইহাদের মধ্যে শুধু "কোকিলই" নিরামিষাশী। সে সম্পূর্ণ

ফলাহারী। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে শৈশবে সে যখন সর্ব্বভুক কাকের বাসায় লালিত পালিত হয়, তখন কাক ইহাকে নির্ব্বিচারে সকল নোংরা ও আমিষ খাদ্যই খাওয়ায়। সে খাদ্য ইহাদের শিশু-উদর বেশ হজম করে এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ খাদ্য সত্ত্বেও ইহারা বেশ পুষ্ট হইয়া
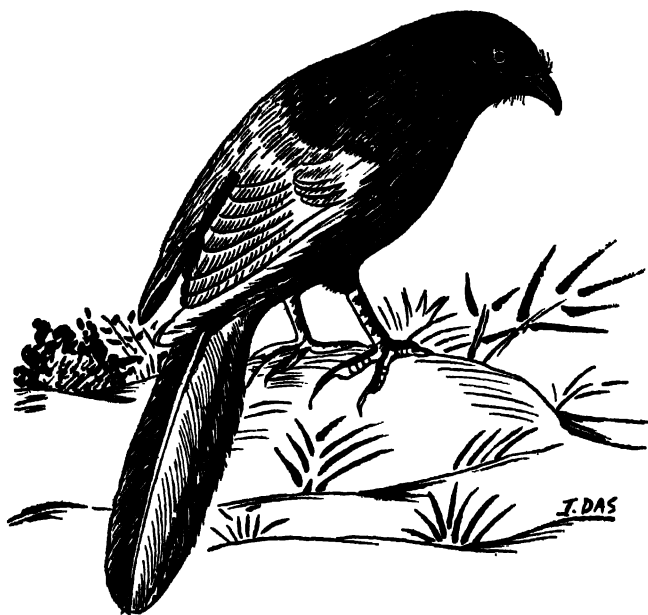
কাণাকুয়া

উঠে। আরও আশ্চর্য্য এই, যে শৈশবে আমিষ-নিরামিষ খাদ্যে রপ্ত হইয়াও, যেদিন হইতে সে কাকের বাসা ত্যাগ করে, সেদিন হইতে শুঁয়াপোকা ছাড়া কোনও আমিষ দ্রব্য স্পর্শ করে না। এই বিধান প্রকৃতির একটা রহস্য না বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে রসিকতা তাহা জানি না।

শালিক

কাকের মত শালিক আমাদের নিত্যসহচর। সুতরাং ইহার সহিত অপরিচিত বাঙ্গালী বোধ হয় নাই। কালো মাথা, বাদামী রঙের এই পাখীটি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। কাকের মতই ইহা দুঃসাহসী, যদিও কাকের মত চৌর্য্য-পরায়ণ নহে। ইহার চলাফেরা, স্বভাব, হাবভাব, ভঙ্গী অতিশয় কৌতূহলপ্রদ।

ইহাদের কর্ণমূলের পীতবর্ণ লোমহীন স্থানটির জন্য ময়না পাখীর সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে তো ইহার নামই "ময়না"। ইংরেজ লেখকরা তাঁদের পুস্তকাদিতে হিন্দুস্থানী নামই গ্রহণ করিয়া থাকেন—সেইজন্য ইহার ইংরেজী নাম "দি কমন্ ময়না"। কিন্তু বাঙ্গালী যে কৃষ্ণবর্ণ, পীতকর্ণ মনুষ্যভাষা-কুশলী পাখীকে "ময়না" বলেন, সে পাখীটি পার্ব্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা, সুতরাং শালিক হইতে ভিন্ন। খাঁচার ভিতর ছাড়া "ময়না"র সঙ্গে আমাদের পরিচয় দুঃসাধ্য। এই শালিক বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্যের "সারিকা"।

শালিককে উভচর বলিলে অন্যায় হইবে না। ইহা বেশ বেগের সহিত উড়িতে পারে; সুতরাং ইহার ডানায় বেশ শক্তি আছে। আবার জমির উপর হলুদে পা দুখানি একটির পর একটি ফেলিয়া বেশ সাবলীলভাবেই বিচরণ করিতে পারে। খুব কম বৃক্ষবিহারী পাখীই ভূমির উপর অবলীলাক্রমে চলিতে পারে। যাহাদের পদদ্বয় হ্রস্ব হয় তাহারা মাটির উপর চলিতে পারে না—যেমন বুলবুল। কিন্তু যে সব পাখী মাটির উপর বিচরণ করে তাহাদের জানুর নিম্নভাগ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়। শালিক এই শেষোক্ত পর্য্যায়ের পাখী।

এইজন্য ভূমির উপর বেশ দ্রুত পদক্ষেপে চলিতে পারে। আবার বৃক্ষশাখায় ইহার গতি বেশ স্বচ্ছন্দ, চঞ্চল ও ক্ষিপ্র—কোথাও জড়তা নাই।

দ্বিতীয় বিশ্ব-সমরের পূর্ব্বে ইংরেজদের চলাফেরার দাম্ভিকতা জগৎ-প্রসিদ্ধ ছিল—প্রায় পৃথিবীটাই যে তার পদানত সে মনোভাবটা তার প্রতি পদক্ষেপে প্রকাশ পাইত। শালিকের চলাফেরার মধ্যেও ঐরূপ একটা দাম্ভিক, কুছ-পরোয়া-নাই মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। সত্য বলিতে কি, শালিক অত্যন্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠা-পরায়ণ পাখী। জীবন-সংগ্রাম তত্ত্বটা যদি সত্য হয় তবে শালিককে সংগ্রামসিদ্ধ বলিতে হয়। একজন ইংরেজ লেখক (ডেওয়ার) ইহাকে 'এ বার্ড অফ্ ক্যারেক্টার' বলিয়াছেন। কথাটা খুবই সত্য। শরীরটা খুব প্রকাণ্ড না হইলেও যে কেহ কেহ তেজী বা সাহসী হইয়া থাকে, একথা শালিকের চরিত্রদ্বারা প্রমাণিত হয়। কাক শালিক অপেক্ষা আকারে ও ওজনে অনেক বড় পাখী। কিন্তু কাককে সে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়ে। কাকের পিছনে লাগা শালিকের একটা ব্যসন। কোনও কাক একাকী যদি শালিকের সাক্ষাৎ পায় তবে সে স্থান ঝটিতি পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য মনে করে। কাক অপেক্ষাও বৃহত্তর চিলের সঙ্গেও শালিককে লাগিতে দেখিয়াছি। চিল হিংস্র-স্বভাবের এবং বদমেজাজী কিন্তু তাহাকেও শালিক অপদস্থ করিতে ছাড়ে না। একবার একটি চিল আমাদের বাসার প্রাচীরের উপর বসিয়া একখানি অপহৃত মৎস্য-খণ্ড আস্বাদনে তৎপর ছিল। এমন সময় একজোড়া শালিক তাহাকে দেখিতে পাইল। একজন চিলের সম্মুখে ও অন্যজন উহার পশ্চাতে গিয়া উপবেশন করিল। কিচির-মিচির ভাষায় চিলকে অনেক বুঝাইল যে অতি-ভোজন করিলে অসুখ করিতে পারে। চিল যখন তাদের উপদেশ বা অনুনয়ে

(যাহাই হউক) কর্ণপাত করিল না, তখন পশ্চাতের শালিকটি সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া চিলের পুচ্ছাগ্রে চঞ্চুদ্বারা টান মারিল। কোনও বিহঙ্গই এই অঙ্গবিশেষ লইয়া রসিকতা বরদাস্ত করিতে পারে না। চিল ঘুরিয়া দুষ্ট শালিককে শাস্তি দিতে অগ্রসর হইল। ইত্যবসরে অপর শালিকটি তাহার খাবার লইয়া চম্পট দিল। কাকের সহিত

শালিক
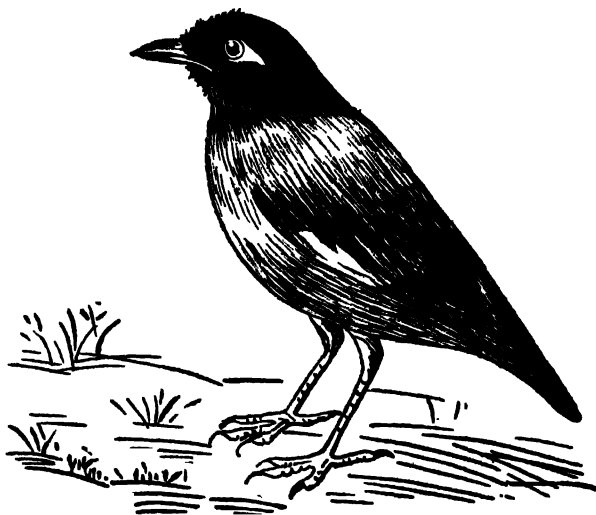
এ ধরণের ব্যবহার শালিক অহরহ করে, একটু নজর দিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন।

শালিক অনেকগুলি একত্রই বিচরণ করিয়া বেড়ায়। আহার অন্বেষণে সকলে পৃথক হইয়া পড়িলেও একজনের ইঙ্গিতে সকলের গতি নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সময় যদি কোনও কাক সেখানে আসিয়া পড়ে,

তবে তাহার অপমানের শেষ থাকে না। কাক সেইজন্য শালিককে ভয় করিলেও, কুনজরে দেখে।

দলবদ্ধভাবে বাস করিলেও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াবিরোধ অজ্ঞাত নহে। ঝগড়া, মল্লযুদ্ধ—এগুলি তাদের জীবনের আমোদ আহ্লাদেরই সামিল। কেননা, ঝগড়া হয় কিন্তু খুনাখুনি হয় না। বিশেষতঃ প্রজননঋতুতে কোনও শালিকতরুণীর পাণিপ্রার্থী কয়েকটি শালিক যুবকের মধ্যে অনেক সময় বচসা ও পরে হাতাহাতি একটা সাধারণ ব্যাপার। যখন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শালিক-যুবকের মধ্যে নখর ও চঞ্চুর সাহায্যে শক্তি পরীক্ষা চলে, তখন অপরাপর সঙ্গীরা তাদের ঘিরিয়া কেহ উৎসাহ ও কেহ টিটকারি দেয়। তাহারা যখন এইরূপে ব্যস্ত থাকে, কাকের তখন মহা স্ফূর্ত্তি হয়। তিন চার জন কাক তখন কেহ গাছের ডালে, কেহ অদূরে ভূমির উপর বসিয়া যুদ্ধ ও যোদ্ধা সম্বন্ধে নানারূপ অভিমত প্রকাশ করিতে থাকে। কখনও কখনও দেখিয়াছি হঠাৎ কাকের মধ্যে কাহারও একটু নষ্টামি করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে এবং সে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া কোনও শালিকের লেজ ধরিয়া টান মারে। শালিক তখন ব্যস্ত থাকায় একটু সরিয়া বসে মাত্র। কিন্তু বেশী জ্বালাতন করিলে কয়েকটি শালিক মিলিয়া কাককে বেশ উত্তমমধ্যম দিয়া দেয়। কাপুরুষ কাক কিল খাইয়া কিল চুরি করে, কিল ফিরাইয়া দেওয়ার সাহস তাহার হয় না। তবে শালিককে একা পাইলে বায়স ছাড়িয়া কথা কয় না। একদিনকার ঘটনা বলি। বৃষ্টি পড়িতেছিল, আমি এক বন্ধু-গৃহে বারান্দায় একেলা শ্রাবণ বরষার ঝরঝরানি গান শুনিতেছিলাম। বাগানের মধ্যে কামিনী ও হেনার ঝোপের নীচে বসিয়া কয়েকটি বায়স বৃষ্টির বিরুদ্ধে তাহাদের অভিমত বেশ সজোরে ব্যক্ত করিতেছিল। উহাদের চীৎকারে আমার চিন্তার ধারা ছিন্ন

গো-শালিক

হওয়ায় উহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। হঠাৎ দেখিলাম একটি শালিক, যে এতক্ষণ একটি ম্যাগনোলিয়ার শীর্ষে বসিয়া আরামে ভিজিতেছিল, সে উড়িয়া আসিয়া কাকসভার মাঝখানে উপবেশন করিল। ভাবটা বোধহয় এইরূপ,—"আমার সামনে তোরা চ্যাংড়ামি করিস?" সহসা শালিকের অতর্কিত আগমনে কাকের কলরব থামিয়া গেল। তাহারা ভাবিল, "একে বৃষ্টি তার উপর এই আপদ।" প্রথমে তাহারা ভীতভাবে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিল, শালিকের দলবল কাছাকাছি আছে কিনা দেখিয়া লইল। যখন বুঝিল যে শালিকটি যূথভ্রষ্ট, নিতান্তই একাকী, তখন তাহারা সোল্লাসে শালিককে আক্রমণ করিল। ইংরেজ যেমন স্বভাবভীরু কালা আদমীর দলে গিয়া খুব খানিকটা হাঁকডাক করিয়া সকলকে ভীতত্রস্ত করিয়া দেয়, শালিকও তেমনি প্রথমটা মিলিটারী মেজাজ ঝাড়িয়াছিলেন। কিন্তু দলে ভারী কাক "হাম্‌ভী মিলিটারী" ভাবে শালিককে আক্রমণ করিল। পঞ্চরথী বেষ্টিত শালিক বেধড়ক মার খাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন করিল। আর একদিন ওয়ালটেয়ারের এক কাননমধ্যে শালিকের আর্ত্ত চিৎকার শুনিয়া দেখি সেখানেও এক শালিক বোধহয় কাক সভায় ১৪৪ ধারার সমন জারি করিতে গিয়াছিলেন। কাকমণ্ডলী অহিংসার ধার ধারে না, একাকী পাইয়া শালিক পুঙ্গবকে এমন ঠেঙ্গাইল যে সে কোনও গতিকে প্রাণ লইয়া রড় দিল।

পক্ষিসমাজে প্রণয়নিবেদন কার্য্যটা পুরুষাংশই বেশীর ভাগ করিয়া থাকে। শালিক পুরুষরা ফ্লার্টেশন ব্যাপারটায় আবার একটু বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। এই অভিসার-আতিশয্য সময় সময় শালিক-তরুণীর বিরক্তিকর বোধ হয়। সেই কারণে কখনও অধিক বেহায়া-পণার জন্য স্ত্রী পাখীর তিরস্কার লাভ করে। এই তিরস্কার ঠোনারূপে বর্ষিত হয়—অর্থাৎ চঞ্চুর আঘাতে শালিকজায়া পতিকে শায়েস্তা করে।

কৃষ্ণমস্তক তাম্রাভ বর্ণের যে শালিক আমাদের গৃহমধ্যে পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিতালী করিতে প্রয়াস পায়, সে স্বয়ং নীড় নির্ম্মাণ করে না। গর্ত্তের মধ্যে বাসা নির্ম্মাণ করা ইহার অভ্যাস। কিন্তু গর্ত্ত খুঁড়িয়া বা খুঁদিয়া লইবার শ্রমস্বীকার সে করে না। কাঠঠোকরা বা বসন্ত-বাউরী পাখীর পরিত্যক্ত কোটর দখল করিয়া তন্মধ্যে শুষ্ক তৃণ, ছিন্ন বস্ত্রের টুকরা, ছোট ছোট কাঠি, পালক, কাগজের টুকরা প্রভৃতি দিয়া একটি গদী তৈয়ার করিয়া তদুপরি সে তাহার ডিম্ব রক্ষা করে। সাধারণতঃ ইহারা সুন্দর নীলবর্ণের ডিম্ব ঊর্দ্ধ সংখ্যা চারিটিকরিয়া পাড়ে।

শালিকের এই অপরের প্রস্তুত গর্ত্তে বাসা রচনা করার অভ্যাসের মধ্যে পক্ষিতত্ত্বের একটা গূঢ় রহস্যের আভাস পাওয়া যায়। বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ সেলুস সাহেব আন্দাজ করেন যে পাখীর এই অপরের বাসা দখল করার অভ্যাস তাহার পরভৃত অবস্থায় বিবর্ত্তনের প্রথম ধাপ। কোকিল কিরূপ পরভৃত তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। প্রশ্ন এই, কোকিল সৃষ্টির আদি হইতেই এইরূপ, না বিবর্ত্তনের ফলে ঐরূপ হইয়াছে? সেলুস বলেন যে, প্রথম প্রথম পাখী পরের পরিত্যক্ত বাসাতেই ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। তাহাতে বাসা প্রস্তুত করিবার পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়। এই অভ্যাসের ফলে পরিত্যক্ত নহে এরূপ অপর পাখীর বাসাতেও ডিম পাড়িয়া ফেলিত। পরে গৃহস্বামীর আগমনে সে বাসা হইতে বিতাড়িত হইলেও তাহার ডিম সেইখানেই থাকিয়া যাইত। ঐ গৃহস্বামী ডিমের পার্থক্য না বুঝিয়া সেই ডিম ফুটাইয়াব াচ্চাকে প্রতি-পালিত করিত। কালক্রমে এই সহজ পন্থাটি তাহার স্বভাবগত হইয়া পড়ায় নীড় রচনা, সন্তান পালন প্রভৃতি দুরূহ কার্য্যের শ্রম হইতে সে মুক্তি পাইল। সেলুস সাহেবের আন্দাজ যদি সত্য হয় তবে আমরা সাধারণ শালিককে পরভৃত হওয়ার পথে প্রথম স্তরে দেখিতেছি। শালিক যে শুধু পরের পরিত্যক্ত বাসায় নিজ নীড় রচনা করে তাহানহে—একটু কষ্ট

স্বীকার করিয়া শয্যাদ্রব্য সংগ্রহ করার ইচ্ছাও যেন তাহার নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কাঠিকুঠি, ঘাস, ন্যাকড়া, কাগজের টুকরা অত্যন্ত সহজলভ্য। তৎসত্ত্বেও দেখা যায় যে শালিক কোনও চড়ুই পাখীর বাসা হইতে সেগুলি চুরি করিতেছে। এই পরিশ্রমবিমুখতার ফলে কালক্রমে শালিক যে পরভৃত হইয়া পড়িবে না, কে বলিতে পারে ?

শালিক আমাদের ক্ষেত-খামারের ফল ও সব্‌জি বাগানের অনেক উপকার করে। এই কারণে যে সব দেশে শালিক নাই সে সব দেশে ভারতবর্ষ হইতে এই পাখী লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আন্দামানে কারাগার নির্ম্মাণ করিয়া ইংরেজ যখন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত লোকেদের সেখানে চাষবাস করিতে নিযুক্ত করিল, তখন শালিক লইয়া গিয়া সেখানে ছাড়িয়া দেয়। নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, মরিসাস ও সুদূর স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে, হনোলুলুতে, কৃষির উপকারী হিসাবে শালিক লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বংশবৃদ্ধি করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা-পরায়ণতার জন্য সে সব স্থানের অনেক অন্য পাখীকে ইহারা উৎখাত করিতেও সমর্থ হইয়াছে।

শালিক মনুষ্যসঙ্গ খুবই পছন্দ করে। আমাদের গৃহাভ্যন্তরে কক্ষ-মধ্যে নিঃসঙ্কোচে গমনাগমন করে। সুতরাং একটু চেষ্টা করিলেই সহজে ইহাকে পোষ মানান যায়। আমার মাতা একবার নীড়ভ্রষ্ট একটি শালিক শাবককে বাগানে পাইয়া সযত্নে লালন করেন। বড় হইয়া শালিকশিশু ছাড়া থাকিত, পলাইত না এবং পোষা কুকুরের মত আমার মাতৃদেবীর পিছনে পিছনে সারা বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইত। আমার ছেলেরা খাইতে বসিলে একটা শালিক বারান্দার ধারে আসিয়া বসিত। একটু ভাত ছিটাইয়া দিতে দিতে ক্রমশঃ তাহার ভয় ভাঙ্গিয়া গেলে, ছেলেরা খাইতে বসামাত্র সে আসিয়া উপস্থিত হইত। শেষকালে ছেলেদের পাত হইতে ঠুকরাইয়া ভাত খাইয়া ফেলিত।

তাড়া করিলে একটু সরিয়া যাইত মাত্র। ইহারা টিয়া ময়নার মত কথা বলিতেও শিখিয়া থাকে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত "শালিক" নামে যাহাকে অভিহিত করিয়াছি, সে হইল আমাদের সাধারণ শালিক। ইংরেজী কেতাবে ইহাকে "দি

J. D Gupta
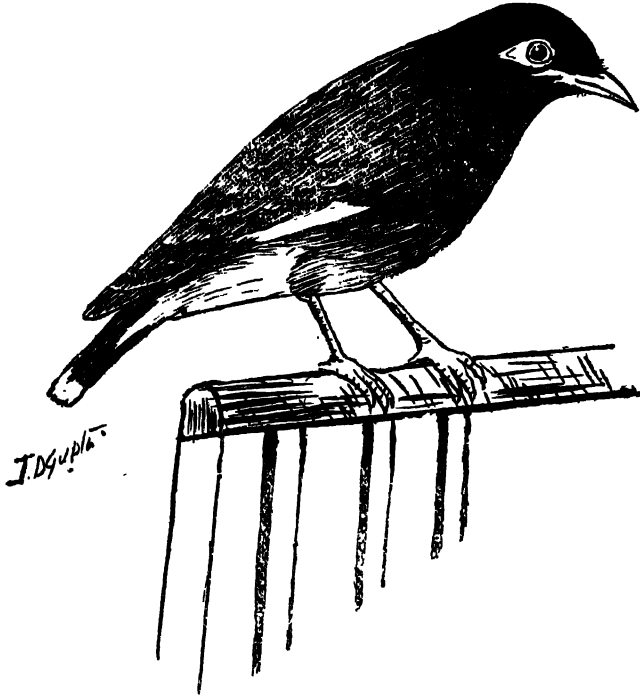
গাঙ শালিক

কমন ময়না" বলা হয়। বাংলা শালিক শব্দটি বিশিষ্ট জাতি (স্পিসিজ্) বাচক নয়। আমাদের পল্লীজনপদে কয়েকপ্রকারের শালিক আছে। কমন ময়নাকে আমরা যদি গৃহশালিক বলি তবে বোধহয় তাহার সংজ্ঞা

ঠিক হয়। ইহার মাথাটি কৃষ্ণবর্ণ, চঞ্চু ও চরণ পীত এবং কাণের পাশে খানিকটা স্থান লোমহীন ও সেখানের চামড়া হলদে। বাকী শরীরটা বাদামী। ডানার ভিতরকার পালক সাদা ও লেজের অগ্রভাগ ও নীচের দিকটা সাদা। ডানা গুটাইয়া যখন মাটির উপর সে বিচরণ করে তখন সাদা অংশগুলি নজরে পড়ে না—উড়ামাত্র মনে হয় পাখীর শরীরের অনেকখানি যেন সাদা।

আর একটি শালিকও আমাদের দেশে সর্ব্বত্র অধিক সংখ্যায় নজরে পড়ে। এরা মানুষের গৃহাঙ্গনে আসিলেও গৃহমধ্যে বড় একটা আসে না। ইহাদের পাড়াগাঁয়ে গুয়েশালিক বা গোশালিক বলে। সাধারণ শালিকের মত ইহার রং অত ঘন বাদামী নহে, হালকা বাদামী এবং বহু শ্বেত রেখায় ইহার অবয়ব বিচিত্রিত। ইংরেজ একে "দি পায়েড ময়না" বলে। ইহা কিন্তু কোটরে বাসা নির্ম্মাণ করে না। তাল খর্জ্জুর, সুপারী প্রভৃতি বৃক্ষের ডালের গোড়ায় একটা বৃহৎ বাসা খড়কাঠি দিয়া তৈরী করে। বাসাটি অত্যন্ত পারিপাট্যহীন হয়।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীর ধারে আর একটি শালিক থাকে। ইহাকে গাঙশালিক বলে। সাধারণ শালিকের মতই দেখিতে এবং আয়তনেও উহার সমান, দেহবর্ণ বাদামীরব দলে গাঢ় ধূম্রবর্ণ (ডার্ক গ্রে), মাথার কালো রং স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এবং চোখের চারিদিকের চর্ম্ম হলদের বদলে উজ্জ্বল লাল। নদীর উচ্চ পাড়ে অনেক সময় একই স্থানে বহু গর্ত্ত পরিলক্ষিত হয়। এই সকল গর্ত্তই ইহাদের নীড়। অনেকগুলি পাখী কলোনী স্থাপন করিয়া শাবকোৎপাদন করে। গর্ত্তের মুখ হইতে চার পাঁচ হাত দীর্ঘ সুড়ঙ্গ খনন করিয়া তাহার শেষ প্রান্তে গোলাকার গুহা করিয়া লয়। তন্মধ্যে ঘাস, পাখীর পালক, ছিন্নবস্ত্র এমন কি সাপের খোলস দিয়া গদী রচনা করে। উপরে বর্ণিত সব কয়প্রকার শালিকেরই ডিম নীল বর্ণের হয়।

ছাতারে বা সাতভাই

"সাতভাই" শুদ্ধ নাম, চলিত নাম "ছাতারে"। ইংরেজ নামকরণ করেছে সেভেন সিসটার্স। ভাইই হউক আর বোনই হউক, ইহা ঠিক যে ইহারা একা কখনও থাকে না। অনেকগুলি পাখী একত্র থাকাই ইহাদের প্রকৃতিগত। সংখ্যায় পাঁচটি হইতে সাতটি পর্য্যন্ত পাখী এক একটি দলে দেখা যায়। সুতরাং ইহারা খুব সামাজিক পাখী তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাদের সামাজিকতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার কারণটাও সহজেই অনুমেয়। পাখীটির দিকে চাহিলেই দেখা যাইবে যে ইহার শরীরের যেন বাঁধুনি নাই। চেহারা চ্যাপসা, নাদুসনুদুস, পালকগুলি যেন কোনও মতে শরীরে লাগিয়া আছে। বিশেষতঃ পুচ্ছটি নড়বড় করিতেছে, যেন আলগোছে শরীরের সঙ্গে লাগান রহিয়াছে, একটু নাড়া দিলেই খসিয়া পড়িবে। কোনও আমিষাশী শিকারী পাখীর কবলে পতিত হইলে এই অল্প-প্রাণ ক্ষীণজীবী পাখী প্রাণের জন্য মোটেই সংগ্রাম করিতে পারিবে না। সুতরাং দলবদ্ধ হইয়া থাকা ছাড়া ইহাদের উপায় নাই—তবু নিশ্চিন্ত, নিঃশঙ্কভাবে চরিয়া বেড়ান যায়। গুপ্ত আততায়ীর অকস্মাৎ আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনবরত সতর্ক থাকিয়া একাকী আহার অন্বেষণ করা সহজ নহে। তাহাতে উদরপূর্ত্তি করিয়া খাওয়া হয় না, এবং যাহা খাওয়া যায় তাহাও বোধহয় হজম হয় না। কিন্তু দলবদ্ধ হইয়া থাকিলে, ছয় সাত জোড়া চোখ যেখানে অনবরত চারিদিকে লক্ষ্য রাখিতেছে, সেখানে কোনও আততায়ী সহসা আক্রমণ করিবার বড় একটা সুযোগ পায়না। ইহাদের চলাফেরার মধ্যে, বা কণ্ঠধ্বনির মধ্যে, এমনই একটা ইঙ্গিত আছে যাহা দ্বারা কোনও একটি পাখীর সাড়াতেই সব পাখী সচকিত

হইয়া এক সঙ্গে সাবধানতা অবলম্বন করে। শালিকের মধ্যেও এই রূপ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কোনও স্থানে হয়তো অনেকগুলি শালিক ইতস্ততঃ খাদ্য অন্বেষণ করিতেছে। সহসা একটি শালিক হ্রস্ব শব্দ করিয়া উড্ডীন হইল। শালিক পাখা মেলিবামাত্র তাহার ডানার শ্বেতবর্ণ অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠে। বোধহয় এই শ্বেতবর্ণ নিশানা দেখিয়াই—তৎক্ষণাৎ আশে পাশে অবস্থিত সবকয়টি শালিক সামরিক শৃঙ্খলার সহিত ভূমি হইতে উত্থিত হয়। ছাতারের এরূপ কোনও বর্ণ-নিশান নাই। হয়তো ভাষার সাহায্যেই তাহারা সম্মিলিত গতি ও চলাফেরা নির্দ্ধারণ করে। ইহাদের দেহের বর্ণ নিরবচ্ছিন্ন নিস্প্রভ ধূসর। তার মধ্যে শ্বেতবর্ণের চক্ষু দুটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। নিস্প্রভ সাদা চঞ্চু ও পদদ্বয় দেখিলে মনে হয় রক্তহীনতায় ভুগিতেছে।

পাপিয়া দেখিলে ছাতারে পাখী খেপিয়া যায় এবং সকলে তারস্বরে চিৎকার করিতে করিতে তাহাকে তাড়া করে। কেন করে, সে কথা কোকিল প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। কাক যেমন কোকিলের চৌর্য্যবৃত্তি ধরিতে পারে না, অথচ কোকিল দেখিলেই তাড়া করে, ছাতারেও অনুরূপ কারণে পাপিয়া দেখিলে অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করে। পাপিয়া প্রহারের ভয়ে না হোক, বাক্যবাণের ধারাপাতে অতিষ্ঠ হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়।

অনেক সময় এই নিরীহ পাখীর বাসা হইতে ইহাদের ডিম্ব ও শাবককে বায়স, হাঁড়িচাচা প্রভৃতি দুরাত্মারা অপহরণ করে। ঐ সব বলিষ্ঠ গুণ্ডাদের সঙ্গে একা পারিয়া উঠা যায় না; দল বাঁধিয়া থাকিলে উক্ত প্রকার আপদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। একাকী যেখানে সাহস দেখান যায়না, দলে ভারী থাকিলে অনেক দুর্ব্বলও সেখানে বীর হইয়া উঠে। ছাতারে পাখীও দলবদ্ধভাবে মাঝে মাঝে বেশ দুঃসাহস দেখাইয়া থাকে। ফ্রাঙ্ক ফিন্ সাহেব বলেন যে তাঁহার জনৈক

বন্ধুর একটি পোষা শিকারী বাজ একদিন এক ছাতারে পাখীকে গ্রেফ্‌তার করে। দলের অন্যান্য ছাতারে অমনিই অকুতোভয়ে সেই বাজের উপর আপতিত হইয়া সঙ্গীকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হয়।

ছাতারে দল বাঁধিয়া কেন থাকে, তাহা বুঝা গেল। কিন্তু এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন উঠে। একটি দলের সবকয়টি ছাতারেই কি এক মায়ের সন্তান, এক পরিবারভুক্ত—এক বংশের? অথবা বিভিন্ন পিতামাতার সন্তান বড় হইয়া দল বাঁধিয়া দুই তিনটি দম্পতি একত্র বাস করিতেছে? ইহাও কি সম্ভব নয় যে ইহারা একটি কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবার, এক ভর্ত্তা আধ ডজন পত্নী লইয়া ঘর সংসার করিতেছে? কিংবা এক দ্রৌপদীর সহিত পাঁচ কি ছয় পাণ্ডব বাস করিতেছে? ইহার কোনও প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না। সেরূপভাবে ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই।

যে সকল পাখী বৎসরের অধিককাল দল বাঁধিয়া বাস করে, তাহারাও প্রায়শঃ প্রজনন ঋতুতে জোড়া বাঁধিয়া পৃথক হইয়া যায়। নীড় নির্ম্মাণ, ডিম পাড়া, ডিমে তা দেওয়া এবং শাবককে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া বড় করিয়া তাহার পর আবার সকলে পুনর্ম্মিলিত হয়। কিন্তু ঐসকল কাজের সময় কেহ কাহারও সঙ্গে মিশে না, স্ত্রীপুরুষই উহা সম্পন্ন করে। ছাতারে কিন্তু প্রসবঋতুতেও একত্র থাকে। যদি ছয় সাতটি পাখীর দলে দুইটি কি তিনটি দম্পতি থাকে, তাহারা কি ভিন্ন ভিন্ন বাসা নির্ম্মাণ করিয়া পৃথক পৃথক গৃহস্থালী পাতে, না সকলে মিলিয়া একই বাসায় ডিম্ব রক্ষা করে? ইহারা যে কমিউনিজমের পক্ষপাতী তাহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কারণ কোনও কোনও ছাতারের বাসায় উর্দ্ধসংখ্যায় আটটি ডিমও পাওয়া গিয়াছে। একটি ছাতারে তিনটি কি চারটির বেশী ডিম পাড়িতে পারে না। ডেওয়ার সাহেব

লিখিয়াছেন যে তিনি তিনটি ছাতারে পাখীকে আহার লইয়া একই নীড়ে গিয়া বাচ্চাদের খাওয়াইতে দেখিয়াছেন।

ছাতারে পাখী অতি সঙ্গোপনে ঝোপে ঝাপে, ঘন পত্রবীথি মধ্যে বা খুব পল্লব-বহুল বৃক্ষে লুকাইয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। এই কারণে ইহার বাসা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। ইহারা আবার নীড়ের ঠিকানা গোপন করিবার জন্য বেশ চাতুরী অবলম্বন করে। সাধারণতঃ প্রজনন-ঋতুতে পাখীর বাসার সন্ধান পাওয়া সহজ। প্রায় সারা দিনই ইহারা আহার সংগ্রহ করিয়া মুহুর্ম্মুহু শাবকদের খাওয়ায়। সুতরাং একটু ধৈর্য্য সহকারে লক্ষ্য করিলেই তাহার বাসা সে নিজেই একরূপ দেখাইয়া দেয়। কিন্তু ছাতারে যদি দেখে যে কেহ তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে তাহা হইলে সে কিছুতেই বাসায় ফিরিবে না। জন-পাঁচ ছয়ের কোন্‌টিকে আপনি অনুসরণ করিবেন? যেটিকে আপনি অনুসরণ করিলেন, সে এদিক ওদিক উড়িতে উড়িতে আপনাকে উল্টা দিকে অনেক দূর লইয়া যাইবে, তৎপর পলায়ন করিবে। আমি এভাবে অনেকবার অপদস্থ হইয়াছি। পাঠককে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সারাদিন কলরব-পরায়ণ এই পাখীকে পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও অঞ্চলে "ফেচো" বলে,—বোধ হয় অনবরত ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে বলিয়া। ইহার কোলাহলপ্রিয়তার জন্য ইংরাজিতেও ইহাদের আর একটি নাম আছে, ব্যাব্‌লার।

নীলকণ্ঠ

দেবাসুরের সম্মিলিত চেষ্টায় সমুদ্রগর্ভ হইতে যে হলাহল উঠিয়াছিল তাহা সন্ন্যাসী ভোলানাথ কণ্ঠে ধারণ করিয়া নাম পাইয়াছিলেন নীলকণ্ঠ। কিন্তু আমাদের দেশে সহরে ও গ্রামে, কাননপ্রান্তে ও মাঠের মধ্যে, রেললাইনের ধারে টেলিগ্রাফের তারে যে খেচরটিকে দেখা যায়, তার নাম কেন নীলকণ্ঠ হইল? যখন সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে তখন তার দেহবর্ণে কোনও বিশিষ্টতা লক্ষিত হয় না। চোখের পাশ ও স্কন্ধদেশ নীলাভ হইলেও তাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। বাকী দেহটি সামান্য গোলাপী আভাযুক্ত বাদামী রঙের। শরীরের গড়ন মোটা-সোটা ঢ্যাপসা গোছের, দোয়েল, শালিক ফিঙ্গে প্রভৃতির মত সুঠাম নহে। কিন্তু যখন সে পক্ষ-বিস্তার করিয়া শূন্যপথে আপনাকে নিক্ষেপ করে, তখন তার পক্ষপতত্রের নিম্নভাগের ঘন নীল বর্ণচ্ছটা ডানার উত্থান পতনের সঙ্গে বিচিত্র দৃশ্যের সৃষ্টি করে—তাহার দেহের রূপ প্রজাপতির মত বর্ণচ্ছটাসমন্বিত হইয়া আমাদের অবাক করিয়া দেয়। মার্কিন দেশের লোক সেইজন্য ইহার নাম দিয়াছে—সারপ্রাইজ বার্ড। ইংরেজ ইহাকে "দি ব্লু জে" এবং "দি ইণ্ডিয়ান রোলার" বলে।

বিলাতী সভ্যতার বিলাসের সামগ্রী যোগাইবার জন্য মানুষ অজ্ঞাতে নিজের অনেক ক্ষতি করে। ইউরোপীয় অঙ্গনাদের শিরোভূষণের জন্য সুন্দর পালকবিশিষ্ট কৃষির উপকারী এরূপ কত পাখীকে যে হত্যা করা হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ পাখীদের মধ্যে নীলকণ্ঠ একটি। ইহার পক্ষের উজ্জ্বল নীল পালক শ্বেতাঙ্গিনীদের পোষাকের জন্য বহুল ব্যবহৃত হয়। এই পাখী কৃষির উপকারী বলিয়া আমাদের দেশে আইন অনুসারে ইহা অবধ্য। এমন কি, ইহাকে বন্দী

করিলেও জরিমানা হয়। এদেশে বন্দুকের লাইসেন্সের সঙ্গে অবধ্য পাখীর ফিরিস্তি দেওয়া হয়। তাহাতে নীলকণ্ঠের নাম আছে। ভারতের বন্দরে বন্দরে কাষ্টম বিভাগ হইতে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত আছে, যাহাতে উপকারী পাখীর পালক রপ্তানী না হয়। কিন্তু উৎকোচের লীলাভূমি ভারতবর্ষে নিষেধ ও পাহারা বজ্রআঁটুনীর ফস্কা গেরোমাত্র। কৃষির পক্ষে হলাহলসম কীটাদি উদরে ধারণ করে বলিয়া হিন্দুরা বোধ হয় একে নীলকণ্ঠ নাম দিয়াছেন। হিন্দুর শাস্ত্রেও এ পাখী অবধ্য।

নীলকণ্ঠের গতিতে ও উড়িবার ভঙ্গীতে কেমন যেন একটা জড়তা ও আলস্যের ভাব আছে। যখন সে শীকারের পশ্চাতে ধাবিত হয় তখনও ক্ষিপ্রতা দেখা যায় না। তাড়াতাড়ি কিছু করা যেন এর প্রকৃতি নহে। ধরিত্রীপৃষ্ঠ হইতেই ইহা খাদ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু শালিকের মত ছুটাছুটি করে না। মাছরাঙা পাখীর মত কোনও একটি উচ্চস্থানে সে নিতান্ত ভাল মানুষটির মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তখন মনে হয় বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ দেখি সে ধীরে, সুস্থে, মন্থরগতিতে ভূমিতে অবতরণ করিল। হয়তো কোনও পতঙ্গ তৃণক্ষেত্রে একটু বেশী রকম আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইল।

বৈশাখের শেষভাগ হইতে নীলকণ্ঠ পঞ্চশরের আঘাতে চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন সে তাহার স্বাভাবিক জাড্য ত্যাগ করে। সেই সময় তাহার উৎপতনভঙ্গী দর্শনীয় হয়। সেই সময় শূন্য মার্গে উঠিয়া বারবার ডিগ্‌বাজী খাইয়া প্রণয়িণীর মন পাইতে চেষ্টা করে। এখানে বলিয়া রাখি যে, সাধারণতঃ পক্ষিজগতে স্ত্রীপুরুষের বর্ণ একই প্রকার হয় না। কিন্তু নীলকণ্ঠদের স্ত্রীপুরুষ একই প্রকার দেখিতে।

দেয়ালের গর্ত্তে, কিংবা কোনও গাছের কোটরে অথবা কোনও

নেড়া খেজুর, নারিকেল বা তাল গাছের দীর্ঘ কাণ্ডের মাথায় গহ্বর মধ্যে ইহারা নাড় রচনা করে। কিছু শুষ্ক তৃণ ও কয়েকটী পালক হইলেই বাসা রচনা হইয়া যায়। স্ত্রীপাখী উহাতে তিন চারটী শুভ্র ডিম পাড়ে। নীলকণ্ঠের শাবক অতি শৈশবেই পিতামাতার দেহের

নীলকণ্ঠ

রং প্রাপ্ত হয়। দেখিতে বোকা ভালমানুষের মত হইলেও বাচ্চাগুলি অত্যন্ত ঝগড়াটে ও লোভী হয় এবং পরস্পরের খাদ্য কাড়িয়া খায়। ইহারা বেশ পোষ মানিতে পারে, যদিও আমাদের দেশে সে চেষ্টা

হয় না। এই অত্যন্ত পেটুক সন্তানদের খাদ্য জোগাইতে ইহাদের জনকজননী মোটেই আলস্য বা বিরক্তি বোধ করে না। শৈশবে বাপমা যতই সন্তান বৎসল হউক না কেন, চলিতে ও উড়িতে শিখিলে অর্থাৎ স্বোপার্জ্জনে সক্ষম হইলে বাপ মা বাচ্চাদের দূর করিয়া দেয়। সুতরাং নীলকণ্ঠ কিরূপ অসামাজিক পাখী বলাই বাহুল্য।

পক্ষিতত্ত্বের পণ্ডিতগণ নীলকণ্ঠের সহিত মাছরাঙার একটা গোত্র সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করেন। কেননা অনেক বিষয়েই এই দুইটী পাখীর সাদৃশ্য দেখা যায়। কোনও এক বিস্মৃত আদিম যুগে ইহারাও মাছরাঙা শ্রেণীভুক্ত জলচর পাখী ছিল। ক্রমশঃ স্বভাবের পরিবর্ত্তনে মাছরাঙা সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। একজন ইংরেজ লেখক বলেন তিনি ইহাকে জলের উপর মাছরাঙার মত একই স্থানে ডানা ঝাপটিয়া জলের মধ্যে ঝপাৎ করিয়া ছোঁ মারিতে দেখিয়াছেন (গর্ডন ডালগ্লীশ)। বহু পাখী স্নানপ্রিয় হয়, তবে কেহ বা জলে স্নান করে কেহ বা ধুলায়। মুরগী, তিতির, ভরত প্রভৃতি পাখীর মত নীলকণ্ঠ ধূলিতে শরীর পরিমার্জ্জিত করে।

মাছরাঙার মতই ইহারা গর্ত্তমধ্যে বাসা নির্ম্মাণ করে ও শুভ্র ডিম পাড়ে। অবশ্য এই দুইটী সাদৃশ্য বিশেষভাবে জ্ঞাতিত্ব পরিচায়ক নহে। এতদ্ব্যতীত দেখা যায় ইহাদের উভয়েরই স্বর কর্কশ ও উচ্চগ্রামের। উভয় পাখীই নিঃসঙ্গ থাকিতে ভালবাসে এবং উভয়েরই খাদ্যান্বেষণ প্রণালী একরূপ। কোনও উচ্চস্থানে চুপ করিয়া নিম্নদিকে খাদ্যের জন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই ইহাদের রীতি—অবশ্য একটী ভূমি হইতে আহার্য্য কুড়াইয়া লয়, অপরটী জল হইতে ছোঁ মারিয়া লয়। মাছরাঙার কথা যখন আলোচনা করিব তখন দেখিব যে আমাদের দেশের পরিচিত মাছরাঙা পাখীগুলির মধ্যেও একটী জাতি নীলকণ্ঠের মত স্থলচরে বিবর্ত্তিত হইবার পথে চলিয়াছে।

নীলকণ্ঠ পাখী কৃষিজীবির পক্ষে অনেক হলাহল উদরসাৎ করিয়া চাষবাসের উপকার করে। চাষের অপকারী কীটাদিই ইহা বেশীর ভাগ ভক্ষণ করে। নানাবিধ বড় বড় পোকামাকড়, ফড়িং উচ্চিংড়ে, ঝিঁ ঝিঁ পোকা, ঘুরঘুরে পোকা, গুবরে পোকা, শুঁয়াপোকা, ও উহাদের আণ্ডাবাচ্চা এই পাখীর খাদ্য। মাঝে মাঝে ভেক ও সর্পও ইহারা মারিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

মাছরাঙা

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদী, বিল ও দহের অভাব নাই, সুতরাং দুই তিন জাতীয় মাছরাঙা থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? মনুষ্যাবাসের সান্নিধ্যে, গৃহসংলগ্ন পুকুর বা ডোবার পাশে আমরা দুটিকে দেখিতে পাই। অপরটিকে নদী ও বৃহৎ জলাশয়েই দেখা যায়। যেটিকে আমরা খুব সচরাচর লক্ষ্য করি সেটি হ্রস্ব-দেহ, ক্ষুদ্রায়তন। আকারে ইহা চড়ুই পাখী অপেক্ষা বড় হইবে না, শুধু দীর্ঘ চঞ্চুটির জন্য এবং একটু হৃষ্টপুষ্ট বলিয়া বড় দেখায়। ইহাদের মস্তকে নীল ও কালো রঙের সমাবেশ এবং দেহের উপরিভাগ নীল। পৃষ্ঠের নীল রঙ বেশ ঘন। দেহের নিম্নভাগ ময়লা লাল রঙ, তামাটে বলা চলে। গণ্ডোপরি খানিকটা সাদা। পা দুখানি যদিও রক্তকমলের মত, চঞ্চুটি একেবারেই কৃষ্ণবর্ণ. লেজটি অত্যন্ত খাটো, যেন লেজ তাহার সমস্ত দৈর্ঘ্যটুকু চঞ্চুকে দান করিয়াছে। চঞ্চুর এই দৈর্ঘ্য ইহার জীবনযুদ্ধের সহায়ক, নহিলে জল হইতে ছোঁ মারিয়া মাছ তোলা সহজ হইত না। জমির উপর চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে হয় না বলিয়া ইহাদের পা দুটি অতিশয় হ্রস্ব। চেষ্টা করিলেও ইহারা ভূপৃষ্ঠে দৌড়াইয়া বেড়াইতে সক্ষম নহে। ইংরেজ ইহার নাম দিয়াছে "দি কমন কিং-ফিসার"। বাংলায় অন্য মাছ-রাঙা হইতে পৃথক করিবার জন্য ইহাকে "ক্ষুদে মাছরাঙা" আখ্যা দিতে পারি।

জলের ধারে বৃক্ষের যে শাখাটি জলের উপর আসিয়া পড়ে তাহারই অগ্রভাগে নিতান্ত মৌনী তপস্বীর মত নিশ্চল হইয়া মাথাটী ঘাড়ের দিকে ঠেলিয়া দিয়া ইহারা বসিয়া থাকে। দৃষ্টি জলের উপর নিবদ্ধ থাকে। মাছ দেখিতে পাইলেই গুলতি হইতে নিক্ষিপ্ত গুলির মত

তীরবেগে নামিয়া ঝুপ করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করে এবং ক্ষণপরেই দেখা যায় যে, একটী মাছকে আড়াআড়ি চঞ্চুবদ্ধ করিয়া সে উঠিয়া পড়িয়াছে। উড্ডীয়মান অবস্থায় মাছ গলাধকঃরণ করিতে ইহারা পারে না, সেইজন্য পুনরায় ডালের উপর আসিয়া মাছটীকে ঠুকিয়া হত্যা করে এবং পরে লম্বালম্বি ধরিয়া মুখমধ্যে চালনা করে। ক্ষুদে মাছরাঙা মাছ ছাড়া অন্য কিছু খায় না। ছোট ছোট মাছই ইহারা শীকার করে। শুনিয়াছি আস্ত মাছটা গলাধঃকরণ করিলেও, আহারের কয়েকঘণ্টা পরে কাঁটাগুলি গোলাকার অবস্থায় উদ্গার করিয়া ফেলে। পেচকদেরও এই অভ্যাস আছে।

খুব বেশী উড়িয়া বেড়াইতেও ইহারা পারে না। ডানা দুটী ছোট বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ। স্বভাবতঃই এরা নিশ্চল আর নীরব, বেশীর ভাগ সময়ই জলের উপর বিলম্বিত কোনও ডালে বসিয়াই কাটায়। কখনও কখনও জলাশয়ের উপরে জলের খুব নিকট দিয়া উড়িয়া যায় এবং সেই সময় ইহাদের কণ্ঠ হইতে কর্কশ ধ্বনি বাহির হয়। ইহারা সঙ্গীপ্রিয় নহে, জোড়ায় জোড়ায় থাকে, অন্য মাছরাঙা সেখানে আসিলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়।

যে মাছরাঙাটী বৃহৎ জলাশয়, নদী এবং বড় খালের ধারে থাকে, সেটী আকারে বেশ বড়, শালিকের মত। ইহাদের গায়ে শুধু সাদা ও কালো রঙের অসংখ্য ডোরা। সুতরাং ইহাকে আমরা "ডোরাদার মাছরাঙা" আখ্যায় অভিহিত করিতে পারি। ইংরেজ ইহাকে "দি পায়েড কিং-ফিসার" বলে। মাছরাঙার মধ্যে এইটী সদা-ক্ষিপ্র ও ও চঞ্চল। ইহারা কেবলই ডানার উপর থাকে। ইহাদিগকে খুব কমই বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। জলের কোন একটা স্থানের সোজা উর্দ্ধে একটা জায়গা তাক করিয়া দ্রুত পক্ষসঞ্চালনদ্বারা অনেকক্ষণ একই স্থানে উড়িয়া থাকিতে পারে। অন্য কোনও পাখী একস্থানে

ক্ষুদে মাছরাঙা

স্থির হইয়া উড্ডীন অবস্থায় থাকিতে পারে না। বোধ হয় কোনও মাছের গতিবিধি লক্ষ্য করে। হঠাৎ পক্ষবিধূনন বন্ধ করিয়া জলের দিকে তীব্র বেগে নামিয়া আসে। মাঝে মাঝে মাছটী অপহৃত হওয়ায় আবার ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলে। এইভাবে উড়িতে উড়িতে এক এক সময়ে সবেগে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডের মত জলের মধ্যে ঝুপ্ করিয়া গিয়া পড়ে। মাঝে মাঝে জলমধ্যে একেবারে তলাইয়া যায়। বোধ হয় মাছের পিছনে খানিকটা ধাওয়া করিতে হয়। ক্ষুদে মাছরাঙা কিন্তু জলে পড়িয়াই উঠিয়া পড়ে, এক লহমাও জলমধ্যে থাকে না। ডোরাদার মাছরাঙা সারাদিন খুব ডাকে, ইহাদের স্বর খুব তীব্র ও ধ্বনি গিটকিরীর মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া যায়। কিন্তু ক্ষুদে মাছরাঙার মত অতটা কর্কশ গলা ইহাদের নহে।

আর এক জাতীয় মাছরাঙা আমাদের দেশে যথেষ্ট সংখ্যায় দেখা যায়। ইহার কণ্ঠ ও বুকের সম্মুখ ভাগ সাদা। মাথা, ঘাড় ও নিম্ন অঙ্গের বক্ষ ব্যতীত, অন্য অংশ লাল্‌চে বাদামী। দেহের ঊর্দ্ধভাগ নীল—ডানাতে কিছু সাদা, লাল ও কালো রং আছে, চঞ্চুটি গাঢ় লাল ও পদদ্বয় টক্‌টকে লাল। সুতরাং ইহার দেহে বহুবর্ণের সমাবেশ রহিয়াছে। ইহার ইংরাজী নাম "দি হোয়াইট-ব্রেষ্টেড কিং-ফিসার"; ইহার ডানার নীচে মধ্যভাগের পতত্রগুলি সাদা হওয়ায় উড়িবার সময় ডানায় একটা স্পষ্ট শুভ্র দাগ লক্ষিত হয়। শালিকের ডানাতেও উড়িবার সময় এইরূপ শ্বেত রেখা চোখে পড়ে। পণ্ডিতরা বলেন যে অনেকগুলি শালিক একত্র যখন মাঠের এদিকে ওদিকে আহার অন্বেষণে রত থাকে, তখন যে কোনও একটী পাখী যদি বিপদের আভাষ পায় সে তখন একরূপ শব্দ করিয়া উড্ডীয়মান হয়। যেই সে পাখা মেলিয়া শূন্যে উত্থিত হয় অমনি এই সুস্পষ্ট সাদা রেখাটী সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। সব পাখীগুলিই এই সাদা রেখার ইঙ্গিতে বুঝিতে

শ্বেতবক্ষ মাছরাঙা

৮২ পৃঃ

হুপো

পারে বিপদ উপস্থিত এবং সকলেই যেন একসঙ্গে চালিত হইয়া স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়ে একথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। সেনানায়কের নীরব বাহুর ইঙ্গিতে যেমন পদাতিক সৈন্যরা চালিত হয়, দলবদ্ধ পাখীরাও একজনের ইঙ্গিতে ঐক্যবদ্ধভাবে চলাফেরা করে। শালিকের ডানার সাদা রেখার তাৎপর্য্য এইভাবে পক্ষি-পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু মাছরাঙা তো দলবদ্ধ হইয়া থাকে না, সুতরাং তাহার ডানার এই উজ্জ্বল শ্বেত রেখাটী প্রকৃতি কি শুধু খেয়াল বশতঃই বিন্যস্ত করিয়াছে? ইহার উত্তর পাওয়া যায় নাই।

নীলকণ্ঠ পাখীর ধরণধারণে যেমন অনেকে সন্দেহ করেন যে সে এক কালে মাছরাঙা ছিল, এই শ্বেতবক্ষ মাছরাঙাটিকে দেখিলে সে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। এই মাছরাঙাটীও বিবর্ত্তনের পথে নিজ জাতীয়তা হারাইতে বসিয়াছে। প্রাণিজগতে বিবর্ত্তন অল্পে অল্পে, এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া চলে যে, অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য না করিলে উহা ধরা যায় না। এই পাখীটীকে লক্ষ্য করিলে ইহার চরিত্রে মাছরাঙা-বিরুদ্ধ কতকগুলি লক্ষণ দেখা যাইবে। যে পাখী মাছ খাইয়াই বাঁচে, তাহার তো জলের ধারেই থাকার কথা। কিন্তু এই সাদা-বুক মাছরাঙাটী এমন বাগানেও থাকে যার ত্রিসীমানায় জল নাই। কলিকাতা সহরে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের আমস হাউসের (এখন যেখানে থানা) অভ্যন্তরে বৃক্ষাগ্রে বসিয়া ইহাকে তারস্বরে চিৎকার করিতে দেখিয়াছি। বুঝা যাইতেছে যে একমাত্র মাছদ্বারা প্রাণটাকে বাঁচাইয়া রাখার অভ্যাস সে পরিত্যাগ করিতেছে। জলের ধারেও যখন সে শীকার খোঁজে তখন সে কদাচিৎ কষ্ট করিয়া শরীর ভিজাইয়া মাছ ধরে। তখনও পাড়ে যে সব ছোট ছোট ভেক বসিয়া থাকে, সেইগুলির প্রতিই ইহার লোভ দেখা যায়। আবার নীলকণ্ঠের মত মাঠে ঘাসের উপর আসিয়া উপবেশন পূর্ব্বক কীটাদি খুঁটিয়া খাইতেও ইহাকে দেখা গিয়াছে।

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে এলাহাবাদ সহরের চৌকের পাশে জিরো রোডে টেলিফোনের তারের উপর এই শ্রেণীর এক মাছ্রাঙা লক্ষ্য করি। মাঝে মাঝে তার হইতে অবতরণ করিয়া রাস্তার আবর্জ্জনা হইতে কাক শালিকের মত খাদ্য সংগ্রহে ইহাকে রত দেখিতে পাইতাম। এরূপভাবে খাদ্য-সংগ্রহ করা মাছরাঙা পাখীর ধর্ম্মবিরুদ্ধ। মাছরাঙা পাখীরা মাটীতে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া গর্ত্ত মধ্যে ডিম্ব রক্ষা করে। কিন্তু এই সাদা-বুক মাছরাঙাকে কতকগুলি পাথরের বড় বড় নুড়ির পাশে কিছু খড়কুটা বিছাইয়া তদুপরি ডিম্ব রক্ষা করিতে কেহ কেহ দেখিয়াছেন। মাছরাঙা জাতীয় অন্য পাখীরা খালি মেজের উপরই ডিম্ব রাখে—অন্যান্য পাখীর মত গর্ত্ত মধ্যে কোনও গদী রচনা করে না। সুতরাং হয়তো কোনও দূর ভবিষ্যতে একদা এই শ্বেতবক্ষ মাছরাঙাটী সম্পূর্ণরূপে স্থলচর পাখী হইয়া পড়িবে এবং তখন ইহাকে 'মাছরাঙা' এই আখ্যা দেওয়া আর চলিবে না।

বসন্তের শেষ হইতে নিদাঘের অন্তপর্য্যন্ত শ্বেতবক্ষ মাছরাঙার সন্তান-জননকাল। ইংরেজী মাস হিসাবে ধরিলে বলিতে হয় মার্চ্চ হইতে জুলাই। ডোরাদার মাছরাঙা জানুয়ারী হইতে এপ্রিল এবং ক্ষুদে মাছ রাঙা জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত শাবকোৎপাদন করে। পুকুর, নদী, ডোবার ধারে উচ্চ পাড়ে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ইহারা সুড়ঙ্গ করে। এই সুড়ঙ্গ ছয় ইঞ্চি হইতে কয়েক হাত দীর্ঘ হয়। সুড়ঙ্গের একেবারে শেষ প্রান্তে পাঁচ, ছয় কিংবা সাতটী ডিম পাড়ে। ডিমগুলি হয় সাদা। অন্ধকার গর্ত্ত মধ্যে যে সব পাখী ডিম্ব রক্ষা করে প্রকৃতি তাদের জন্য সাদা রঙের ডিমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অন্ধকারে দেখিতে সুবিধা হয় বলিয়াই এই নিয়ম। কেননা দেখিতে না পাইলে ঠিক মত তা দেওয়া না হইতে পারে—পেটের নীচ হইতে সরিয়া গেলে পাখীর

নজরে না পড়ায় ডিম প্রয়োজন মত উত্তাপের অভাবে পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

মাছরাঙাদের মধ্যে নীলকণ্ঠের মত স্ত্রীপুরুষের দেহের বর্ণে কোনও প্রভেদ নাই। যে সব পাখী উন্মুক্ত খোলা নীড় রচনা করে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীপাখীর বর্ণ পুরুষপাখীর মত উজ্জ্বল হয় না, সাদামেটে কিংবা নিষ্প্রভ হয়। নীড়োপবিষ্টা অবস্থায় যাহাতে আততায়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, বোধ হয় সেইজন্য প্রকৃতি এই নিয়ম করিয়াছেন। মাছরাঙা, নীলকণ্ঠ, কাঠঠোকরা, বাঁশপাতি প্রভৃতি পাখী গর্ত্তমধ্যে নীড় নির্ম্মাণ করে বলিয়াই সম্ভবতঃ ইহাদের স্ত্রীপুরুষের বর্ণে কোনও পার্থক্য রাখা বিধাতাপুরুষ নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন।

হাঁড়িচাচা

বাংলার পল্লীর প্রত্যেক বাগানে ইহার বাস। এই পাখী মানুষের সান্নিধ্য পরিহার করিয়া চলে না, বরং আমাদের উঠানে এমন কি সময় সময় বারান্দার রেলিং-এ আসিয়াও উপস্থিত হয়। অবশ্য বৃক্ষশাখাবিহারী এই পাখীটিকে কলিকাতার মত বড় বড় সহরে দেখা যায় না, কেন না বাগান ইহাদের বিচরণক্ষেত্র। কিন্তু কলিকাতার উপকণ্ঠে ইহাকে যথেষ্ট দেখা যায়। ইহার সুদীর্ঘ পুচ্ছটির জন্য পাঠকের ইহাকে চিনিতে বেগ পাইতে হইবে না। ইহার দেহ শালিক অপেক্ষা বড় হইবে না, কিন্তু পুচ্ছটি একফুট লম্বা হইবে। পুচ্ছটির আবার বাহার আছে। পুচ্ছের মধ্যভাগের পালক দুইটি দীর্ঘতম, তাহার অব্যবহিত দুই পার্শ্বের পালক তদপেক্ষা হ্রস্ব এবং একেবারে দুই প্রান্তের পালকদুটি হ্রস্বতম। লেজের রং সাদা তবে ধবধবে নয়, ময়লা, এবং উহার অগ্রভাগ কালো। মাথা, ঘাড় ও বক্ষোদেশ কাল, তবে উজ্জ্বল কালো নয়। শরীরের অপর অংশ বাদামী। ডানার পালকগুলির মধ্যভাগের রং লেজের মত— সাদা এবং কৃষ্ণবর্ণের অগ্রভাগ বিশিষ্ট, সুতরাং ডানার উপর মলিন সাদা একটি রেখা দেখা যায়। ইহাদেরও স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বর্ণের কোনও তারতম্য নাই, যদিও ইহারা উন্মুক্ত নীড়ই রচনা করে, গর্ত্তে নহে। ইহার চক্ষু ও চঞ্চু দেখিলেই বুঝা যাইবে যে আমাদের চির-প্রতিবেশী বায়সের সঙ্গে ইহার নিকট সম্বন্ধ আছে। একজন ইংরেজ লেখক ইহাকে "ক্রো ইন্ কলার্স" বলিয়াছেন। ইহারা বাস্তবিকই বায়স-গোষ্ঠি সম্ভূত। তবে কাকের মত ধূর্ত্ত ইহারা নহে। চৌর্য্যবৃত্তিও ইহারা করে, তবে মানুষের ঘরে নহে; অন্য বিহঙ্গের

হাঁড়িচাচা

নীড় হইতে ডিম ও বাচ্চা জোগাড় করিয়া প্রাতরাশ করিতে ইহাদের দেখা যায়। তাহা হইলেও কাককে অন্য পাখীরা যতটা সন্দেহের চোখে দেখে, ইহাকে ততটা খারাপ মনে করে না। কিন্তু পক্ষিজগতের শান্তিরক্ষক বা চৌকিদার ফিঙ্গে ইহাকে দাগী সম্প্রদায়ভুক্তই মনে করে এবং হাঁড়ীচাচা দেখিলেই ফিঙ্গের মেজাজ খারাপ হইয়া উঠে।

ইহার শরীরে সাদা কালো রঙ্গের সমাবেশের জন্য এবং ইহা বৃক্ষবিহারী বলিয়া ইংরেজ ইহার নাম দিয়াছে "দি ট্রি পাই"। ইহাদের বাংলা সংজ্ঞাটি ইহারা গলার স্বরের জন্য লাভ করিয়াছে। মাটির হাঁড়ি একখানি খোলা দিয়া ঘর্ষণ করিলে যে শ্রুতিকটু শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত ইহাদের স্বরের সাদৃশ্য বশতঃই বোধহয় ইহা এই নাম, বা বদনাম, লাভ করিয়াছে। তবে সব সময়েই যে ঐরূপ কর্কশ স্বর ইহার কণ্ঠ হইতে বাহির হয়, তাহা নহে। প্রজনন ঋতুতে ইহাদের যে স্বর শুনিয়াছি তাহাকে শ্রুতিকটু বলা চলে না। বায়সের জ্ঞাতিভ্রাতা হইলেও তাহার মত অশ্রাব্য কর্কশ স্বর ইহাদের নহে। সাধারণতঃ যে স্বরটি ইহাদের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হয় ইংরেজ লেখকরা তার পরিভাষা করিয়াছেন—"কক্-লী"। পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য অঞ্চলে উহার পরিভাষা "কুটুম-আলি" অর্থাৎ কুটুম্ব আসিলি। তাই ইহাকে "কুটুম" পাখীও বলে। এই পাখী বাড়িতে আসিয়া ঘন ঘন ডাকিলে বাড়ীতে কুটুম্ব আসে এইরূপ প্রবাদ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। ইহার কণ্ঠস্বর একটু উচ্চ-গ্রামের হইলেও বর্ষাকালে তাহা বেশ মিষ্টতা প্রাপ্ত হয়।

গাছের শাখা হইতে শাখান্তরে উড়িয়াই ইহারা দিবসের বেশীর ভাগ সময় কাটায়। কীটভুক্ পাখী বলিয়া ভূমির উপরও মাঝে মাঝে আসিয়া বসে। কিন্তু ধরিত্রীপৃষ্ঠে ইহাদের গতিবিধি লালিত্য-

হীন। চড়াই, ঘুঘু প্রভৃতির ডিম ও বাচ্ছা চুরি করিয়া অনেক সময় ইহারা উদর পূরণ করে। আহার সম্বন্ধে ইহারা বেশ উদার। পেটে ক্ষুধা থাকিলে আমিষ নিরামিষ বা সামগ্রীর বাছবিচার করে না। একবার এক ভদ্রলোক ইহাকে গোটা একটা বাদুড় উদরসাৎ করিতে দেখিয়াছিলেন।

কাককে যেমন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, হাঁড়িচাচাও তদ্রূপ আসমুদ্র হিমাচলের সকলস্থানে দৃষ্ট হয়।

শীতের অবসানে গাছের কচিপাতায় যখন সবুজ রং ধরে, ইহাদেরও তখন যৌবনউৎসব আরম্ভ হয়! ইহারা তখন জোড়া বাঁধিয়া বসন্ত উৎসব সমাধা করিয়া বংশরক্ষার কার্য্যে মন দেয়। ইহাদের আঁতুড় ঘর গাছের উপরেই নির্ম্মিত হয়। এজন্য ইহারা বড় বড় গাছের আগ-ডালই পছন্দ করে। কলিকাতার সন্নিকটস্থ গ্রামগুলিতে ইহাকে আমি আমগাছেই অধিকাংশ নীড় বাঁধিতে দেখিয়াছি। তবে নীম, অশ্বথ, বাবলা ও শিরীষ গাছেও ইহাদের বাসা পাওয়া যায়। পাখী-গুলি দীর্ঘ লেজের জন্য আকারে বড় সুতরাং বাসাগুলিও বেশ বড়ই হয়। কাকেরই মত ইহাদেরও বাসারচনার কোনও পারিপাট্য নাই। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে ছোট ছোট পাখীরাই সাধারণতঃ বাসারচনায় নৈপুণ্য ও কারু-কৌশল প্রকাশ করে। কাক, হাঁড়িচাচা প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী পাখীরা কোনও প্রকার শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দেয় না। হাঁড়িচাচার বাসার ভিত হয় সরু সরু ডালপালা দিয়া এবং তজ্জন্য কাঁটাগাছের ডালই ইহারা অধিক ব্যবহার করে। বাসার অভ্যন্তরে ঘাসের গদি করিয়া তদুপরি ডিম রক্ষা করে।

ইহাদের ডিমগুলি দেখিতে একরকমের হয় না। প্রায় পাখীদেরই ডিমের বর্ণে নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যে কারণে ডিম দেখিয়া কোন

পাখীর তাহা আমরা বলিতে পারি। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হাঁড়িচাচার ভিন্ন ভিন্ন রকমের—সাদা, ধূসর, ফিকে গোলাপী, সবুজ প্রভৃতি ডিম পাওয়া গিয়াছে। পক্ষিতত্ত্ববিৎ সুধীগণ এখনও এইরূপ পার্থক্যের কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। বৈশাখ হইতে আষাঢ়ের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইহাদের প্রজননকাল। ছোট বাচ্চাগুলি দেহে পালক গজাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাপ মায়ের বর্ণ প্রাপ্ত হয়। সব পাখীদের ক্ষেত্রে তাহা হয় না, পূর্ণবয়স্ক পাখীর দেহবর্ণ পাইতে একটু দেরী লাগে। ইহাদের শাবকগুলিও অত্যন্ত পেটুক হয় এবং খাবারের জন্য অহরহ চিৎকার করে। পক্ষিতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় একবার আগরপাড়ায় এক হাঁড়িচাচার বাসা হইতে দুইটি শাবক অপহরণ করিয়া আনিয়া খাঁচায় পূরিয়া রাখেন। তাঁহার ভৃত্য অবশ্য নিয়মমত ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া ইহাদের খাওয়াইত। কিন্তু মানুষ দেখিলেই ইহারা এরূপ তারস্বরে চিৎকার ও সশব্দ অনুনয় করিত যে ইহাদিগের মুখে কিছু না দিয়া খাঁচার পাশ দিয়া হাঁটা যাইত না। বাগানের মধ্যে ইহারা যে ভাবে গলাবাজী করিতে করিতে ডানা ঝাপটাইয়া পিতামাতার অনুসরণ করে ও খাদ্যের জন্য অনুনয় জানায়, তাহা দেখিবার মত। আশ্চর্য্য, ইহাদের পিতা-মাতার কখনও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। সারা বর্ষাকালটা ইহারা এইরূপ করিয়া পিতামাতার পিছনে পিছনে ফেরে। বর্ষাকালে পোকা মাকড়ের অভাব হয় না, সুতরাং ইহাদের বাপমাও আব্দার সহ্য করিয়া আহার জোগায়। কিন্তু শরতের আগমনে পাখীদের গৃহস্থালী ভাঙ্গিবার সময় হয়। পশুদের মধ্যে অপত্যস্নেহ খুব স্বল্পকালস্থায়ী। যতক্ষণ উহা বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ উহা অত্যন্ত প্রবল। সন্তান বিপন্ন ভাবিলে পিতামাতা নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়া আততায়ীকে যুদ্ধ প্রদান করে। কিন্তু সন্তান যখন বড় হয়, আত্মরক্ষা করিতে

সক্ষম হয় এবং স্বয়ং আহার্য্য সংগ্রহ করিতে শেখে, তখন বাপমা ইহাদের জন্য আর কোনও চিন্তা করে না—বরং অনেক সময় নিজেদের ডেরা বা আড্ডার নিকট আসিলে বিতাড়িত করে। হাঁড়িচাচার মধ্যেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।

ফিঙ্গে

এই পাখী বাংলার প্রাকৃতিক শোভার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। ইহার ঘনকৃষ্ণবর্ণ, ছিপছিপে ঋজু দেহ, কল্‌কার মত সুদীর্ঘ পুচ্ছ—এবং ক্ষিপ্র, চঞ্চল উৎপতন-ভঙ্গি ইহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই। অথচ বাঙ্গালী কবিদের প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে এই পাখীর উল্লেখ পাই না। শুধু ৺সতেন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতায় এর উল্লেখ পাই, তাঁহার "কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল—" কবিতাটিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কোথায় এমন "ফিঙ্গে গাছে গাছে নাচে"। তাঁহার প্রকৃতই সৌন্দর্য্যবোধ ছিল, পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ছিল, তাই আমাদের গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে এই কুচকুচে কালো পাখীটির বেপরোয়া গতিভঙ্গির সুষমা তাঁহার চোখে ধরা পড়িয়াছিল। যাঁহারা রেলপথে যাতায়াত করেন, এই পাখী তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। কেন না, লাইনের ধারে ধারে, টেলিগ্রাফের তারের উপর বা রেল কোম্পানীর জমির সীমা-নির্দ্দেশক তারের বেড়ার উপর দুই তিনটা খুঁটির ব্যবধানে এক একটি বা এক জোড়া ফিঙ্গে অবশ্য দেখা যাইবে। ইহার দেহায়তন বুলবুল অপেক্ষা অধিক নহে। কিন্তু এর দীর্ঘ পুচ্ছখানির জন্য ইহাকে বড় দেখায়। ইহার পুচ্ছের সব পতত্র সমান নহে, বাহিরের পতত্রগুলি দীর্ঘতম এবং তারপর ভিতর দিকে ক্রমশঃ দুই দিকেই হ্রস্ব হইয়া মাঝখানে আসিয়া হ্রস্বতম হইয়াছে, ফলে পুচ্ছের দুইদিকে কল্‌কার আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই আর একটি পাখী যাহার স্ত্রী পুরুষ একই রকম দেখিতে।

ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এই পাখীটির মেজাজ কিন্তু একেবারে আহেল

বিলাতী শ্বেতাঙ্গের মত। অপর জাতীয় কোনও পাখী ফিঙ্গে সম্বন্ধে অকারণ কৌতূহল প্রকাশ করিলে অবিলম্বে ফিঙ্গে তাহাকে ভদ্রতা শিখাইয়া দেয়। চৌর্য্যকুশল বায়সকে ফিঙ্গে মহাশয় মোটেই সহ্য করিতে পারে না। তাহার বাসার পাশ দিয়া কাককে উড়িয়া যাইতে দেখিলে ফিঙ্গের মেজাজ তিরিক্ষি হইয়া উঠে। ফিঙ্গে দম্পতি তখন মিলিত আক্রমণে সুতীক্ষ্ণ চঞ্চু ও নখরাঘাতে কাকের পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। কাক এমনই কাপুরুষ যে সে তাহার অতবড় শরীর সত্ত্বেও ফিঙ্গেকে দেখিতে পাইলে পলাইতে পথ পায় না। ইংরেজ ফিঙ্গেকে "কিং ক্রো" এবং "ব্ল্যাক ড্রোঙ্গো" এই উভয় নামে অভিহিত করে। সংস্কৃত বৃহৎ-সংহিতায় কাকবিরোধী "চাষ" পাখীর উল্লেখ আছে। এই "চাষ" সম্ভবতঃ ফিঙ্গে।

জ্যৈষ্ঠমাসের প্রারম্ভ হইতে ফিঙ্গে নীড় নির্ম্মান আরম্ভ করে। খুব উচ্চ গাছের মাঝামাঝি বা উপরদিকের দুইটি শাখার সন্ধিস্থলে ডালের উপর ইহারা নীড় স্থাপন করে। ইহাদের বাসা শূন্যে দোদুল্যমান হয় না। কিছু শুষ্ক ঘাস, খুব সূক্ষ্ম লতাতন্তু শিকড় একত্র করিয়া ডালের উপর গদির মত সাজায়। তারপর মাকড়সার জালের মিহিতন্তু জোগাড় করিয়া এই গদিটিকে তদ্বারা জড়াইয়া ডালের সঙ্গে আঁটিয়া বাঁধে। অবশেষে উক্ত গদির উপর ফিঙ্গে ও ফিঙ্গেজায়া উভয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শরীরের চাপে উহাকে ঠাসিয়া মাটির প্রদীপের মত একটি ছোট আধার প্রস্তুত করে। এই আধারটি ফিঙ্গেজায়ার আঁতুড় ঘর হয়। তিনি ইহার মধ্যে তিন চারিটি শুভ্র বা ঈষৎ লাল আভাযুক্ত ডিম পাড়েন। ডিমের গায়ে অতি ক্ষুদ্র রক্ত বা বাদামী বর্ণের ছিটে থাকে।

সন্তানজননের সময় ফিঙ্গের স্বভাবতঃ রুক্ষ মেজাজ আরও রুক্ষ হইয়া উঠে। এই সময়ে সে এমন দুর্দ্ধর্ষ হয় যে চিলের মত বড় ও হিংস্র পাখীকেও বাসার কাছে দেখিলে ধাওয়া করে। বাংলার ব-দ্বীপে জলা-

স্থানে মাছ্‌ধরা বাজ (ফিসিং ঈগল) আছে। এগুলি প্রকাণ্ড পাখী। সন্ধ্যা-সকালে ও গভীর রাত্রে ইহাদের উচ্চ চিৎকারধ্বনি আকাশ প্রকম্পিত করিয়া তোলে এবং বালক ও শিশুদের অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার করে। যশোর ফরিদপুর অঞ্চলে ইহাকে বজরইলা বলে। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার নাম কুরর। ফিঙ্গে অনেক সময় এই অতিকায় পাখীকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। ছোট ছোট পাখীর তো কথাই নাই। হয় তো কোন একটি ছোট পাখী একটি কীট আহরণ করিয়া খাইবার উপক্রম করিয়াছে; ফিঙ্গে তাহা দেখিতে পাওয়া মাত্র সশব্দে পাখীটিকে আক্রমণ করে। বেচারী পাখীটি প্রাণভয়ে মুখের গ্রাস ফেলিয়া পলায়ন করে এবং ফিঙ্গে অতিশয় অম্লানবদনে পরিত্যক্ত কীট উদরসাৎ করে। ইহাতে মোটেই সে বিবেকের দংশন বোধ করে না। পুলিশপুঙ্গবের মতই নিরীহ মানুষের উপর তম্বী করিতে ইহারা পটু। এবং এই সাদৃশ্যের জন্য অনেক স্থানে বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে ইহার নাম "কোতোয়াল" পাখী।

যদিও অনেক সময় ছোট ছোট পাখীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া আত্মসাৎ করা অভ্যাস, তবু অনেক দুর্বৃত্ত পাখীকে জব্দ করিয়া রাখে বলিয়া ছোট পাখীরা ইহার প্রতি কৃতজ্ঞ। সেইজন্য প্রজননকালে অনেক দুর্ব্বল পাখী ফিঙ্গে যে গাছে বাসা বাঁধে, সেই গাছেই কিংবা তাহার সন্নিকটস্থ বৃক্ষে নিজেদের নীড় বাঁধিয়া গৃহস্থালী পাতিয়া নিশ্চিন্ত বোধ করে। দু'একটা কীট পতঙ্গ কাড়িয়া খাইলেও, অন্য কোনওরূপ অত্যাচার ফিঙ্গে করে না। সুতরাং ফিঙ্গের প্রতিবেশীরূপে তাহারা নির্ব্বিঘ্নে ঘরকন্না করে। বিশেষ করিয়া দেখিবেন—হল্‌দে পাখী ফিঙ্গে যে গাছে বাসা বাঁধে সে গাছ ছাড়া অন্য গাছে নিজ নীড় স্থাপন করে না।

ফিঙ্গে নানারকম স্বর কণ্ঠ হইতে বাহির করিতে পারে। তন্মধ্যে

কতকগুলি স্বর বেশ সুমিষ্ট। বিশেষতঃ বর্ষাকালে ফিঙ্গের গলা বেশ মনোহর হয়। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মত ফিঙ্গে অল্প নিদ্রাতেই সন্তুষ্ট। অনেক রাত্রে সে শয়ন করে (কথাটা ঠিক হইল না—পাখীরা শয়ন করে না, তবে নিদ্রা যায়) এবং অতি প্রত্যুষেই নিবাসবৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া শিকার সন্ধানে বাহির হয়।

ফিঙ্গে পাখীও স্নান করিতে খুব ভালবাসে। ঠিক মাছরাঙার মত ইহাও উড়িতে উড়িতে সহসা বেগে জলমধ্যে নিপতিত হইয়া ক্ষণপরেই উত্থিত হয়। ছোট ছোট মাছও সে এইরূপে ধরিয়া সে আহার করে। তবে কীটপতঙ্গই ইহার আহার্য্য। নানারূপ উড়ন্ত পতঙ্গের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ঘুরিয়া ডিগ্‌বাজী খাইয়া যে ভাবে ইহা শিকার ধরে তাহা দেখিবার বিষয়। ফিঙ্গে কদাচিৎ জমির উপর শিকার ধরিতে আসে, তবে একেবারে যে আসে না তাহা নহে। গবাদি পশুর পৃষ্ঠদেশে বসিয়া ফিঙ্গে শিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে ভালবাসে। গরু মহিষ যখন মাঠে ঘাস খায় তাদের বৃহৎ শরীরের পদতাড়নায় অনেক কীট-পতঙ্গ ভূমি হইতে উত্থিত হয়, সেগুলি সহজলভ্য হয় বলিয়া সে এরূপ করে। শালিক, বক প্রভৃতি পাখী গরুর আশেপাশে পিছনে পিছনে হাঁটিয়া এই সব পতঙ্গাদি শিকার করে। ফিঙ্গে গোমহিষের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সে কার্য্য করে। সুদীর্ঘ পুচ্ছটির জন্য ভূমিতে স্বচ্ছন্দ-বিচরণ ইহার পক্ষে সম্ভব হয় না।

ইহারা শস্য হানিকর কীটাদি ভোজন করে, শস্যের উপকারী পোকা আদৌ স্পর্শ করে না। শস্যের ক্ষতিকর পোকা এরা এত অধিক ধ্বংস করে যে ইহারা সত্যই মানুষের বন্ধু হিসাবে গণ্য হইবার উপযুক্ত। ইহাকে খাঁচায় ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা বা হত্যা করা মানুষের স্বার্থের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

"কেশরাজ" ও "ভীমরাজ" নামে ফিঙ্গের দুটি জাতি আছে। প্রথমটি

বোধহয় আংশিক যাযাবর এবং মাথায় ঝুঁটি তাহার বিশেষত্ব। 'ভীম-রাজকে খাঁচার পাখীরূপে দেখা যায়। ইহারা হরবোলা পাখী, তাই তাহাদের আদর। ইহা পরিচিত পাখী নহে, কেননা সুন্দরবনের অরণ্য-মধ্যে বা পার্শ্বে এবং নিম্ন পর্ব্বতমালার বনানীমধ্যেই ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ফিঙ্গে এত পরিচিত পাখী এবং এত অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় যে ইহার ছবি আমরা এ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিলাম না।

হল্‌দে পাখী

(ওরফে "বেনে-বউ" বা "খোকা-হোক")

সুবৃহৎ বৃক্ষসমন্বিত বনানী বা কানন—যেখানে খুব ঘন, সেইখানে বড় বড় গাছে পত্রবীথির অন্তরালে উজ্জ্বল হল্‌দে রঙের একটি লাজুক পাখী প্রায়ই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এরূপ বর্ণাঢ্য পাখী বাংলার পল্লীকাননে খুব কম আছে। ইহার দেহের পীতবর্ণ অত্যন্ত গাঢ় ও উজ্জ্বল তৎসঙ্গে স্থানে স্থানে ঘনকৃষ্ণবর্ণের সমাবেশ থাকায় হল্‌দে ভাগ আরও সুস্পষ্ট মনে হয়। ইহার বাংলা নাম স্থান বিশেষে "কৃষ্ণগোকুল," "বেনে-বউ," "খোকা-হোক" প্রভৃতি। ইংরেজ একে "ওরিওল" বলে। হুপো ও কাঠঠোকরাকে বাদ দিলে "হল্‌দে পাখীর" মত বর্ণসুষমায় উজ্জ্বল পাখী বোধহয় বাংলার পল্লীপ্রান্তরে আর নাই।

শুধু যে বর্ণসুষমায় এই পাখী মনোহর তাহা নহে, ইহার ডাকটিও খুব মিষ্ট। ইহার কণ্ঠে দোয়েলের মত সুরের ধারা নাই; কয়েকটি হ্রস্ব লঘুস্বর মাত্র ইহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হয়। এই স্বরটী শুনিতে "খোকা-হোক" বলিয়া মনে হয়, সেইজন্য কোনও কোনও অঞ্চলে ইহাকে "খোকা-হোক" পাখী বলা হয়।

এই পাখী ফলভুক এবং ইহা উচ্চ বৃক্ষমধ্যে থাকে বলিয়া ভূমির উপর ইহাকে কখনও দেখা যায় না। ইহারা লোকালয় মধ্যে বাস করিলেও অত্যন্ত লাজুক। কেহ লক্ষ্য করিতেছে অনুভব করিলেই ঘন পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে। তবে এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে যখন উড়িয়া যায় তখন ইহাদের দেহের বর্ণচ্ছটায় বাগান যেন আলো করিয়া যায়। ইহারা খুব সামাজিক পাখী নহে সেইজন্য এক জোড়া ভিন্ন অধিকসংখ্যক পাখী একত্র চলাফেরা করে না। কিন্তু তাই

বলিয়া দোয়েলের মত সগোত্র-বিরোধী নহে। একই বাগানে অনেক জোড়া হলদে পাখী নির্বিবাদে থাকে।

পাখীদের মধ্যে টুনটুনি পাখী ও বাবুই পাখীর বাসারচনায় নিপুণতার জন্য খ্যাতি আছে। কিন্তু হলুদে পাখীর বাসা সচরাচর চোখে পড়ে না বলিয়া অনেকের ধারণা নাই যে ইহারাও নীড় নির্ম্মাণে কুশলী শিল্পী। উচ্চ বৃক্ষের উপর দিকে নাতিবৃহৎ দুইটি ডালের সংযোগস্থলে ইহারা দোদুল্যমান নীড় বাঁধে। ইহারা সত্যই নীড়টাকে ডালের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে। দীর্ঘ ফিতার মত বল্কল এ ডাল হইতে ও ডালে বহু পাক দিয়া জড়াইয়া বেশ সুদৃঢ় একটি দোলনা তৈয়ার করে। তৎপর তন্মধ্যে আস্তরণ দিয়া বেশ একটি ঝুলন্ত গোলাকার বাটী প্রস্তুত করিয়া লয়।

ফিঙ্গে প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে ফিঙ্গে যে গাছে বাসা নির্ম্মাণ করে ইহারা সেই গাছেই বাসা নির্ম্মাণ করিবে। ক্বচিৎ পার্শ্বস্থ বৃক্ষ এজন্য নির্ব্বাচিত করে। হলুদে পাখী অত্যন্ত নিরীহ পাখী। ফিঙ্গে অত্যন্ত জবরদস্ত, তাহার নীড়বৃক্ষের সান্নিধ্যে কোনও প্রকার আমিষ-ভোজী চৌর্য্যপরায়ণ পাখীকে সে আসিতে দেয় না। উহার সন্নিকটে বাসা রচনা করিয়া হলুদে পাখী নিজেকে নিরাপদ মনে করে। এপ্রিল, মে ও জুনমাসেই লক্ষ্য করিলে ইহাদের নীড় দেখা যাইবে। এই নীড়মধ্যে ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ডিম ইহারা এক একবার প্রসব করে। ডিমগুলি হয় ধবধবে সাদা, বহু লাল ছিটা সমন্বিত। কখনও কখনও লাল দাগগুলি থাকে না। তার পরিবর্ত্তে সমস্ত ডিমটার গায়ে ঈষৎ গোলাপী আভা থাকে।

আমাদের পল্লীঅঞ্চলে দুইরকমের হলুদে পাখী সাধারণতঃ দেখা যায়। ইহার দেহের কৃষ্ণ ও পীতবর্ণের সংস্থানের দ্বারাই দুইটি পাখীর প্রভেদ সূচিত হয়। একটির শরীরে পীতবর্ণেরই আধিক্য। কালো রং থাকে

চোখের উপরে ও পিছনে, ডানায় পালকে এবং পুচ্ছের উপরিভাগের পালকে। অপর পাখীটির মাথা, ঘাড়, গলা সম্পূর্ণ কালো, এবং শরীরের বাকী অংশ প্রথমটির মত। প্রথমটিকে ইংরেজী বইতে "দি ইণ্ডিয়ান ওরিওল" ও দ্বিতীয়টিকে "দি ব্ল্যাক হেডেড ওরিওল" বলা হয়। এই পুস্তকে প্রথমটির ছবি দেওয়া হইল। ইহাদেরও স্ত্রীপুরুষে বিভিন্নতা ধরা যায় না। বাংলাদেশে কৃষ্ণমস্তক হলদে পাখী সংখ্যায় বেশী। যদিও ইহারা ফলভুক পাখী এবং দেহের উজ্জ্বল বর্ণের জন্য খাঁচার পাখী হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য, তবু ইহাদের কখনও বন্দী করিবার চেষ্টা হয় নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে ইহারা খাঁচার মধ্যে যত যত্নই লওয়া হউক, বাঁচে না।

হুপো

ঘন পল্লববীথির মধ্যে আত্মগোপন করিয়া বেড়ায় না, অথচ হল্‌দে পাখীর মতই বর্ণসুষমাসম্পন্ন আর একটি পাখী আমাদের দেশে আছে। ইহার ইংরাজী নাম হুপো এবং হিন্দী নাম "হুদ্ হুদ্"। শব্দটি আরবী ভাষা হইতে আসিয়াছে কেন না প্রাচীন আরবে এ পাখীর অত্যন্ত কদর ছিল। রাণী শেবা যখন রাজা সলোমনের মনোহরণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁর উপঢৌকনের মধ্যে একটি "হুদ্ হুদ্" পাখীই শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন হিসাবে সলোমন কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছিল। ইহার বাংলা নাম কি আমি জানিনা। উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে সর্ব্বত্রই ইহাকে দেখিয়াছি। সর্ব্বত্রই ইহার নাম স্থানীয় লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। বেশীর ভাগ লোকই ইহাকে কাঠঠোকরা বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কেহ কেহ কাদাখোঁচা বলিয়াছে; তাহার কারণ এই যে ইহার চঞ্চুটি দীর্ঘ। কিন্তু এই চঞ্চু ঈষৎ বক্র এবং সূচাল; কাঠ ঠুকরাইবার মত মোটেই সুদৃঢ় নহে। ইহাকে কাঠে ঠোকরাইতে দেখাও যায় না। মাটি খুঁচিয়া বেড়ানই ইহার অভ্যাস। আমাদের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি যে কিরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে তাহা আমি অনেক স্থানে পাখীর নাম জানিবার চেষ্টার সময় উপলব্ধি করি। যাই হোক, হিন্দী নামটি একটু শ্রুতিকটু বলিয়া মনে হয়। তাই ইংরেজী নামটিই চালাইবার চেষ্টা করিলাম।

বাংলার সর্ব্বত্রই ইহাকে পাওয়া যায় সুতরাং ইহাকে চিনিয়া লইতে কাহাকেও বেগ পাইতে হইবে না। জনবিরল পল্লীপ্রান্তেও ইহাকে পাওয়া যায়, আবার জনবহুল নগর মধ্যেও ইহাদের অবাধ গতিবিধি আছে। ইহার মস্তক, কণ্ঠ, স্কন্ধ, বক্ষ ও নিম্নদেশ ফিকে

বাদামী বর্ণের। সমস্ত পৃষ্ঠদেশ জুড়িয়া ডানাদুটির উপর বেশ চওড়া কতকগুলি সাদা ও কালো রেখা। ইহার বিশিষ্টতা ইহার মস্তকের শিরোশোভায়। জমির উপর যখন সে বেশ নিশ্চিন্ত মনে বিচরণ করে তখন ইহার সুদীর্ঘ ঝুঁটিটি সঙ্কুচিত হইয়া পৃষ্ঠের সহিত সমান্তরাল ভাবে মাথা হইতে খানিকটা পিঠের উপর বাহির হইয়া থাকে। একটু ত্রস্ত বা সচকিত হইবার কারণ ঘটিলেই এই ঝুঁটি খাড়া হইয়া পাখার মত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন আর উহাকে ঝুঁটি বলা চলে না, মুকুট বলিতে হয়। এই ঝুঁটির অগ্রভাগ ঘন কৃষ্ণবর্ণের হওয়ায় দেখিতে মনোহর।

কতকগুলি পাখী আছে যাহারা শুধু দেখিতে সুন্দর নহে, তাহাদের চালচলন, ভাবভঙ্গীও খুব কৌতূহলোদ্দীপক। "হুপো" সেইরূপ পাখী।

ইহার আহারসংগ্রহ প্রণালী অতিশয় অভিনব। মাঠের উপর ক্ষিপ্র চঞ্চল পদক্ষেপে চলিতে চলিতে কোনও স্থানে ইহার সূচাগ্র চঞ্চুদ্বারা মাটি খোঁচাইতে আরম্ভ করে। এইভাবে খোঁচাইয়া দীর্ঘ চঞ্চুটি মাটির ভিতর অনেকখানি প্রবেশ করাইয়া পোকা টানিয়া বাহির করিয়া আহার করে। ইহারা সম্পূর্ণ আমিষাশী পাখী, মিক্সড ডায়েটে ইহারা বিশ্বাস করে না। চাষের ক্ষতিকর কীটাদি ইহা বেশীর ভাগ খায় বলিয়া এদেশের অস্ত্র আইনে ইহাকে হত্যা বা বন্দী করিলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কৃষিপ্রধান প্রাচীন মিশরে এই পাখী অবধ্য ছিল এবং পূজিত হইত। মিশরবাসীদের দেবতা হোরামের মূর্ত্তির সঙ্গে এই পাখীর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাদের স্নান করার অভ্যাস খুব বেশী, তবে জলে নহে, ধূলায়। কতকগুলি পাখী আছে যাহারা ধূলায় শরীর ঘর্ষণ করিয়া ও খানিকটা বালু বা ধূলা অঙ্গে ছিটাইয়া পরে চঞ্চু দ্বারা অঙ্গ পরিমার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত

করে। হুপো এইরূপ করে। চড়ুই পাখীরাও ধূলিস্নানে অভ্যস্ত।

ইহাদের উৎপতনভঙ্গীও অভিনব। সোজা সরল রেখা ধরিয়া ইহারা উড়ে না। ঢেউয়ের মত উঠিয়া পড়িয়া অগ্রসর হয়। যদিও খুব বেগে ইহারা উড়ে না, তবু উড়িতে উড়িতে সহসা ডানদিকে বা বাম দিকে বোঁ করিয়া ঘুরিয়া যাইতে পারে—যেন কাহারও হুকুম শুনিয়া "রাইট হুইল" বা "লেফ্‌ট্‌ হুইল" করিতেছে।

"হুপো" বা "হুদ্‌-হুদ্‌" এই উভয় আখ্যাই বোধহয় ইহার কণ্ঠধ্বনি হইতে আসিয়াছে। ইহা সর্ব্বদাই 'উপ-উপ' এইরূপ একটা শব্দ বাহির করে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের কণ্ঠে অন্য কোন ধ্বনি নাই। ইহাদের বর্ণসুষমাই আছে, কণ্ঠসুষমা একেবারেই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের কণ্ঠস্বর কর্কশ নহে।

ইহারা কোটরে নীড় রচনা করে। যে কোনও একটি গর্ত্ত পাইলেই হয়, তাহা গাছেই হউক কিংবা বাড়ীর দেয়ালেই হউক। তবে দেয়ালের গর্ত্ত পাইলে—গাছ ইহারা পছন্দ করে না। রংপুরে আমার বাসার অন্দর মহলে, উঠানের অপরপারে রন্ধনশালার বহির্ভাগের দেয়ালে ছাদের অব্যবহিত নিম্নে একটি গর্ত্তে এক জোড়া হুপো আসিয়া প্রতি বছর শাবোকৎপাদন করিত। ইহারা খুব ক্ষুদ্র প্রবেশমুখসম্পন্ন গর্ত্ত পছন্দ করে, যাহাতে পক্ষী সমাজের গুণ্ডারা প্রবেশ করিয়া ডিম্ব বা শাবকের অনিষ্ট না করিতে পারে। নিদাঘকালেই ইহারা ডিম পাড়ে। ডিমগুলি ফেনশুভ্র হয় এবং সংখ্যায় ৪।৫টি করিয়া হইয়া থাকে। ডিম পাড়িবার পর স্ত্রী পাখীটি বাসায় প্রবেশ করিয়া ডিম্বোপরি উপবিষ্টা হয় এবং শাবক নির্গত না হইলে সে আর নীড় হইতে বাহির হয় না। এই সময়ে পুরুষপাখীটি অতি যত্ন সহকারে আহার সংগ্রহ করিয়া স্ত্রীকে খাওয়ায়। ইহারা সামাজিক নহে, জোড়ায় জোড়ায় বাস করে। তবে শাবকগুলি

বড় হইবার পরও কিছু দিন পিতামাতার সঙ্গে থাকে বলিয়া বৎসরে একটা সময়ে কয়েকটি পাখীকে একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যে হুপোকে দেখা যায় সেটি এখানকার বাসিন্দা—যাযাবর নহে, তবে শীতকালে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় যাযাবর হুপোকে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই আগন্তুক পাখীটির বাদামী রংটা একটু গাঢ়তর।

ইহারা মনুষ্যাবাসের কাছাকাছি এমন কি লোকালয়ের মধ্যেও বাস করে। শালিক, চড়ুই বা কাকের মত মানুষের গা ঘ্যাঁসা ইহারা নহে। সুতরাং উৎপাত বলিয়া গণ্য হয় না। আমার বাসার মধ্যে যে হুপোজোড়াটি আসিত তাহারা বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সান্নিধ্য বাঁচাইয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে আসা যাওয়া করিত এমন কি উঠানের মৃত্তিকামধ্য হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লইত। আমার মনে হয় দোয়েলের মতই হুপোদম্পতির একজনের মৃত্যু না হইলে পরস্পরকে ইহারা ত্যাগ করে না এবং প্রতি বৎসর একই স্থানে আসিয়া শাবক উৎপাদনের কার্য্য করিয়া থাকে। এই পুস্তকে যে চিত্র দেওয়া হইল আশাকরি তাহা হইতেই পাঠকের ইহাকে চিনিয়া লইতে অসুবিধা হইবেনা।

কাঠঠোক্‌রা

আমাদের দেশে বর্ণসুষমায় সমৃদ্ধ যে কয়টি পাখী আছে, তন্মধ্যে কাঠঠোকরা একটি। তবে অনেকের ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, কেন না এই পাখী বৃক্ষবিহারী হওয়ায় বেশীর ভাগ সময় ইহারা বনমধ্যে বা ছায়াঘন কাননমধ্যেই থাকে। আমরা কয়জন কষ্ট স্বীকার করিয়া বিহঙ্গদের আচরণ লক্ষ্য করি?

ইহাদের আহার অন্বেষণপ্রণালী কৌতূহলোদ্দীপক। যে গাছটাকে সাময়িকভাবে শিকারক্ষেত্র করে, তাহাতে প্রথমে প্রায় মূলদেশে যাইয়া বসে এবং গাছের কাণ্ডে চঞ্চুদ্বারা হাতুড়ীর মত ঘা দিতে দিতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে অগ্রসর হয়। কখনও কখনও সড়াৎ করিয়া খানিকটা নামিয়া আবার উঠিতে থাকে। এইরূপে যখন একটা গাছের শীর্ষে আসিয়া পৌঁছে তখন উড়িয়া আর একটি গাছের নিম্নদেশে যাইয়া তাহারও অগ্রভাগের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়।

প্রাণীজগতে কীটপতঙ্গ ও জীবাণুর সংখ্যা করা যায় না। অন্য যে কোনও জীবের তুলনায় এরা লক্ষগুণ বেশী। যদি এই সব কীট-পতঙ্গের বিনাশের ব্যবস্থা বিধাতা না করিতেন, তবে এ পৃথিবীতে মানুষ টিঁকিয়া থাকিতে পারিত না। খেচর জগতের প্রাণীরা, অর্থাৎ পাখীরা, বহু লক্ষ কীট প্রতিদিন উদরসাৎ করিয়া, এই পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করিয়া দেয়।

পাখী যে তার বিচিত্র বর্ণ বা সুমধুর সঙ্গীতে শুধু আমাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে। আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদনে এবং আমাদের বাণিজ্যসম্পদ সংরক্ষণে সাহায্য করে বলিয়াই ইহাদের নিকট সকল মনুষ্যসমাজ কৃতজ্ঞ।

এক এক জাতীয় পাখী এক এক প্রকার কীট ধ্বংস করে। আবাবিল, বাঁশপাতি প্রভৃতি উড্ডীয়মান কীট পতঙ্গ শিকার করে। ফিঙ্গেও বেশীর ভাগ তাই করে, তবে সে ভূচর কীটও ছাড়িয়া দেয় না। শালিক, হুপো, নীলকণ্ঠ, দোয়েল—এরা ভূপৃষ্ঠ-বিচরণ-কারী ষট্‌পদী কীটাদি দ্বারা জীবনধারণ করে। কাঠ্‌ঠোকরা কেবল বৃক্ষাদিতে, গাছের ত্বকের অভ্যন্তরে যে সব কীট থাকে তাহাই খায়। এই সব কীট টানিয়া বাহির করিয়া ধ্বংস করিবার জন্তই যেন বিশ্বকর্ম্মার কারখানায় ফরমাইস দিয়া বিধাতা এর অবয়ব গঠিত করিয়াছেন।

ইহাদের জিহ্বাটি দীর্ঘ, লিক্‌লিকে এবং আঠাযুক্ত। উহার অগ্রভাগ আবার করাতের মত কণ্টকিত। গাছের বাকলের ভিতরে বা কোনও সরু গর্ত্তমধ্যে কীট আসিলে এর জিহ্বাটি তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং জিহ্বার আঠায় কীটটি জড়াইয়া গিয়া একটানে পাখীর মুখগহ্বরে আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন কোনও কীট তাহার জিহ্বার নাগালেরও বাহিরে থাকে, তখন বৃক্ষকাণ্ডের উপরিভাগে চঞ্চুটির দ্বারা সবলে আঘাত করে। গর্ত্তমধ্যস্থ কীট ভয় পাইয়া বাহিরে আসিতে চেষ্টা করা মাত্র কাঠঠোক্‌রার "জিহ্বায়ত্ত" হয়। পিঁপড়ে, উই ও ঘুন জাতীয় যে সমস্ত কীট কাঠ নষ্ট করে তাহাদের বিলোপ সাধন করিয়া কাঠঠোক্‌রা মানুষের উদ্ভীদসম্পদ রক্ষা করিতে সাহায্য করে। সুতরাং মানুষের কাছে ইহাদের একটা বিরাট অর্থনৈতিক মূল্য আছে।

খাদ্য অন্বেষণ করিবার সময় পদদ্বয় যথাসম্ভব ফাঁক করিয়া তীক্ষ্ণ নখদ্বারা বৃক্ষগাত্র আঁকড়াইয়া ধরে এবং সুদৃঢ় হ্রস্ব লেজটি গাছের গায়ে লাঠিতে ভর দিবার মত চাপিয়া ধরে। তাহার পর দীর্ঘ গ্রীবাটি পশ্চাৎদিকে যথাসম্ভব লইয়া গিয়া সম্মুখভাগে সজোরে হাতুড়ীর মত চালিত করে। সুদৃঢ় চঞ্চুর আঘাতে যে শব্দটি উত্থিত হয় তাহা বেশ উচ্চ। এই উচ্চ ঠক্‌ ঠক্‌ ধ্বনি বাংলার পল্লীকাননে দিনের বেলা প্রায়ই শ্রুত হয়।

যখন নীড়রচনার সময় আসে, তখন বৃক্ষকাণ্ডের নানাস্থানে ঘা মারিয়া ফাঁপা জায়গা খুঁজিয়া বেড়ায়। ফাঁপা স্থান পাইলে চঞ্চুটিকে কুড়ালীর মত ব্যবহার করিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত পূর্ব্বক অতি পরিপাটি সুগোল প্রায় তিন ইঞ্চি ব্যাসের একটি গর্ত্ত খনন করে। কোনও নিপুণ ছুতারও বোধহয় ওরূপ নিখুঁত গোলাকার গর্ত্ত কাঠে খুদিয়া উঠিতে পারে না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেই শাবক-উৎপাদনে তৎপর হয়। এই সময়ে ইহার চঞ্চুর আঘাতজনিত উচ্চ ঠক্ঠক্ ধ্বনিতে বাগান মুখরিত হইয়া উঠে।

গাছের বিবর খননেই ইহারা যত নিপুণতা প্রকাশ করে। কিন্তু কোটরটির মধ্যভাগে কোনও প্রকার শয্যারচনা করে না। পাখীরা প্রায়শঃই নানারূপ দ্রব্য দিয়া নীড় আস্তৃত করিয়া একটি গদির মত ডিম্বাধার রচনা করে। কিন্তু ইহারা বৃক্ষকোটরের শক্ত মেজেই ডিম্ব ও শাবকের জন্য পর্য্যাপ্ত মনে করে। ইহাদের ডিম শ্বেতবর্ণের এবং সংখ্যায় এক একবারে তিনটি করিয়া হয়।

সচরাচর যে কাঠঠোক্রা আমরা দেখিতে পাই তাহার পুরুষ-পাখীটির মস্তক ও ঝুঁটি উজ্জ্বল লাল। পৃষ্ঠের সম্মুখভাগ উজ্জ্বল পীতবর্ণ পশ্চাতের অংশ ও পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ। ডানার পালক শ্বেত ও পীতবর্ণ এবং তদুপরি শ্বেত ফুট্‌কিও থাকে। ঘাড়ের দুইপাশ শ্বেত হইলেও বহু কালো রেখায় বিচিত্রিত। স্ত্রীপাখীর দেহের বর্ণ পুরুষের মত, শুধু মস্তকটি কালো এবং তদুপরি শুভ্র রেখায় ত্রিকোণ আঁকা। ইহাদের গ্রীবা দীর্ঘ হয়; প্রকৃতির খেয়ালে এই ব্যবস্থা কেন, তাহার কারণ বোধহয় আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না। ইহারা আদৌ সামাজিক পাখী নহে। একই বাগানে একটা বা একজোড়া পাখী ছাড়া অন্য কাঠঠোক্রাকে দেখা যায় না।

ইহারা ঘনসন্নিবিষ্ট কাননমধ্যে নিকটবর্ত্তী গাছ হইতে গাছে

উড়িয়া বেড়ায় বলিয়া, খুব বেশীদূর একটানা উড়িয়া যাইবার ক্ষমতা বিধাতা ইহাদিগকে দেন নাই। উড়িবার সময় ডানা দুইটি এত দ্রুত সঞ্চালিত হয় যে তাহার ফরফর ধ্বনি বেশ স্পষ্ট শুনা যায়। খানিকটা উড়িয়াই ইহাদিগকে নিম্নাভিমুখে যাইতে হয়, কেন না গাছের মূলদেশের দিকই ইহাদের গন্তব্য স্থান। সুতরাং পক্ষদ্বয় খুব দ্রুত কয়েকবার বিধুনিত করিয়া গুটাইয়া লইয়া শূন্যপথে যেন সে ডুব দেয়। একটু অপেক্ষাকৃত দূরে যাইতে হইলেও সে সোজা উড়িয়া যায় না, খানিকটা সোজা উড়িয়া পাখা গুটাইয়া একবার "ডাইভ" করিয়া আবার ডানা মেলিয়া উর্দ্ধদিকে নিজেকে উৎক্ষিপ্ত করে। এইরূপে উঠিয়া পড়িয়া অগ্রসর হওয়া ইহার স্বভাব। ডানার উপরে ইহাদের গতি খুব স্বচ্ছন্দ বলিয়া বোধ হয় না, মনে হয় যেন উড়িতে ইহাদের কষ্ট বোধ হইতেছে।

পাখীরা সচরাচর যেভাবে শাখার উপর উপবেশন করে ইহারা সেরূপ করে না। অন্যান্য পাখী শাখার উপর আড়াআড়ি ভাবে বসে। ইহারা লম্বালম্বী ভাবে শাখাটিকে আঁকড়াইয়া ধরে, উপবেশন করে বলিলে ভুল হইবে। কোনও ডালের নিম্নভাগে ঐরূপে আঁকড়াইয়া বেশ অবলীলাক্রমে ডাল বাহিয়া মাথার দিকে বা লেজের দিকে দুইদিকেই বেশ দ্রুতগতিতে চলিতে পারে।

ইহারা আত্মগোপনপ্রয়াসী পাখী নহে। ইহাদের খাদ্য অন্বেষণের ধারা ও উজ্জ্বল বর্ণ সে পথে মস্ত বাধা। সেইজন্য ইহাদের কণ্ঠে বিধাতা তীব্র ধ্বনি দান করিয়াছেন। ইহাদের কণ্ঠধ্বনিতে উদারা হইতে তারা পর্য্যন্ত সব পর্দ্দাই ধ্বনিত হয়। মাছরাঙার ধ্বনির সঙ্গে ইহাদের কণ্ঠ-ধ্বনির সাদৃশ্য আছে। তবে ইহাদের স্বর আরও উচ্চ, তীব্র ও কর্কশ, কাণে আসিয়া যেন বিঁধে। উড়িতে উড়িতে চিৎকার করাই ইহাদের অভ্যাস। ইহাদের ডাককে হ্রেষা রব বলিলেই সঙ্গত হয়। গাছে উপবেশন করিয়া ইহারা ডাকে না।

ইহার পৃষ্ঠদেশের উজ্জ্বল পীতবর্ণের জন্য ইংরেজ লেখকগণ ইহাকে "গোল্ডেন ব্যাকড উড পেকার" বলিয়া বর্ণনা করেন। ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে এই একটীমাত্র কাঠঠোক্‌রা একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ হইয়া আছে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে অবশ্য কয়েকটী বিভিন্ন প্রকারের অন্যবিধ গাত্রবর্ণের কাঠঠোক্‌রা আছে।

বসন্ত বাউরী

যে দুইটী পাখীর বর্ণনা এই প্রবন্ধের অন্তর্গত, তাহাদিগকে বাংলার সর্ব্বত্রই বহুসংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের বাংলা নাম আমি খুঁজিয়া পাই নাই। হিন্দী ভাষায় ইহাকে "বসন্ত" বা "বসন্ত-বাউরী" বলে। যেটী আকারে বৃহত্তর তাহাকে "বড়া বসন্ত" এবং অন্যটাকে "ছোট বসন্ত" বলে। "বাউরী" শব্দটী বোধহয় "বৌরাহা" শব্দের অপভ্রংশ। ইহার অর্থ উন্মাদ। বসন্তকাল আরম্ভ হওয়ার দিন হইতে সারা গ্রীষ্মকাল ইহাদের নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়ে "টোংক্ টোংক্" ডাকে কান ঝালাপালা হইয়া উঠে। সেইজন্য ইহাকে "বসন্ত পাগল" বলা হয় কি না জানিনা। সেই হিসাবে আমি বাংলাতে ইহার "বসন্ত বাউরী" আখ্যাই গ্রহণ করিলাম। কেহ কেহ "বসন্ত বৈরী" চালাইতে চাহেন। ইহাকে বসন্তের শত্রু বলি কি করিয়া? এখন পাঠকের অভিরুচি। কোকিলের মত ইহাদিগকেও বসন্তের বার্ত্তাবহ বলা চলে, কেন না সরস্বতী পূজার সমসাময়িক কালেই ইহাদের কণ্ঠস্বর স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে।

ইংরেজ একে বারবেট বলে। তবে যেটি আকারে বড় সেইটিকে গ্রীন বারবেট অথবা ব্লু ফেসেড বারবেট নামে অভিহিত করে। ছোটটিকে বলে—কপারস্মিথ কিম্বা ক্রিমজন ব্রেষ্টেড বারবেট। কাঁসারীদের পাড়ায় যেমন সারাদিন নিরবচ্ছিন্ন ঠং ঠং শব্দ শোনা যায়, আমাদের কাননে উপবনেও বসন্তকাল হইতে বর্ষাকাল পর্য্যন্ত এবং কখনও কখনও শীতকালেও 'টংক—টংক—টংক' ধ্বনি শুনা যায়। একচোটে পঁচিশ ত্রিশবার এইরূপ শব্দ হইয়া মিনিট দুইয়ের জন্য থামিয়া পুনরায় শব্দ আরম্ভ হয়। এবং ক্ষণমাত্র বিরামের পর

এইরূপে সারাদিন ইহারা ধ্বনি করে। এই ধ্বনি শুনিলেই বুঝিবেন—নিকটেই "ছোট-বসন্ত" রহিয়াছে। ইহার কণ্ঠস্বরের জন্যই ইহার মারাঠি নাম—"জুক্‌টুক্‌"।

"বড় বসন্তের" কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাগানের মধ্যে মাঝে মাঝে বেশ উচ্চগ্রামে "কুটুর-কুটুর কুটুরর—কুটুর্‌" শব্দ করিয়া থামিয়া যায়, এবং বেশ খানিকক্ষণ বিরামের পর আবার ঐরূপ ডাক বাহির হয়। ছোট বসন্তের মত অবিরত ইহারা ডাকে না। এক একটা কণ্ঠধ্বনির ধমকের মাঝখানে বেশ খানিকটা বিরাম থাকে।

ইহারা উভয়েই ঘন পত্রবহুল বড় বড় গাছের উচ্চতর শাখা মধ্যেই বিচরণ করিতে ভালবাসে। যদিও ইহারা নিজেদের অস্তিত্ব বেশ জোর গলায় জাহির করে, তবু ইঁহাদের দর্শন পাওয়া সুলভ নহে। ইহাদের সবুজ গাত্রবর্ণ সবুজ পাতার সঙ্গে মিশিয়া ইহাদিগকে অদৃশ্য করিয়া রাখে। তবে ইহারা "হলদে পাখীর" মত লাজুক নহে। মানুষের আভাস পাইলেই লুকাইত হইবার চেষ্টা করে না। সুতরাং একটু ধৈর্য্যসহকারে নিরীক্ষণ করিলে ইহাদের আবিষ্কার করা শক্ত নহে।

মোটামুটি সবুজ বর্ণের পাখী হইলেও ছোট পাখীটির দেহে বর্ণবৈচিত্র্য আছে। চঞ্চুর মূলদেশে তিনটি বর্ণের সমাবেশ হইয়াছে। ঠিক চঞ্চুর গোড়ায় উপরদিকে ললাট ও ঘাড়ের খানিকটা উজ্জ্বল টক্‌টকে লাল, গাল, গলা, আর চোখের উপরে ও নীচে খানিকটা বেশ উজ্জ্বল হলদে। চঞ্চুর নিকট হইতে একটা কালো দাগ ঘাড় পর্য্যন্ত যাইয়া ঊর্দ্ধে মাথা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে সবুজ আছে। বাকী দেহটা ঈষৎ পীত আভাযুক্ত সবুজ—লেজে নিম্নদিকে নীল রংও আছে। চঞ্চুটি ঘনকৃষ্ণবর্ণ, পা দুটি লাল। লেজটি অতিশয় ছোট হওয়ায় ইহাদের চেহারাটা বেঁড়ে দেখায়। আবার চঞ্চুর

মূলদেশে কতকগুলি রোঁয়া গুচ্ছের মত বাহির হইয়া থাকায় ইহাদের আরও অদ্ভূত দেখায়।

বড় পাখীটির দেহে ছোটটির মত অতগুলি বর্ণের সমাবেশ নাই। এটির দেহের সবটাই সবুজ, শুধু মস্তকটি পীতাভ বাদামী এবং চোখের চার পাশ কমলা লেবুর বর্ণের মত।

ইহারা প্রধানতঃ ফলভুক্। বটপাকুড়ের ফল এদের খুব প্রিয়, সেইজন্য এই উভয়বিধ গাছে ইহাদের খুঁজিলেই পাওয়া যায়। তবে নিছক নিরামিষাশী নহে। ইহারা কীটাদিও ভোজন করে।

মার্চ্চ মাস হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ইহাদের সন্তানজনন কাল। এই সময় লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে একটি বসন্ত চুপ করিয়া শাখার উপর বসিয়া আছে। আর একটি ধ্বনি করিতে করিতে অনবরত মাথাটী নোয়াইতেছে। এই দ্বিতীয়টী হইলেন পুরুষ। ইনি ঐভাবে স্ত্রী পাখীটীর মনোহরণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কাঠঠোক্‌রার মত ইহারাও বৃক্ষকোটরে নীড় নির্ম্মাণ করে। এবং ঐ পাখীর মতই মস্তকরূপী হাতুড়ী ও চঞ্চুরূপ বাঁটালির সাহায্যে ইহারা বৃক্ষকাণ্ডে গর্ত্ত করিয়া লয়। কাঠঠোক্‌রার মতই ইহারাও গাছের ফাঁপাস্থান বাছিয়া লয়। সব সময়ে অবশ্য ফাঁপা ডাল পাওয়া যায় না। তখন গর্ত্তের মুখ হইতে নীড় পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুড়ঙ্গটাও চঞ্চুর আঘাতে খনন করিয়া লইতে হয়। ইহারাও সুনিপুণ সূত্রধর এবং অতি পরিপাটী সুড়ঙ্গ খনন করে। এই কার্য্যের জন্যই প্রকৃতির বিধানে ইহাদের চঞ্চু গোড়ার দিকে পুরু এবং অগ্রভাগ সূচাল। ইহাদের বাসা নির্ম্মাণে একটা বিশেষত্ব এই যে ইহারা ডালের উপরিভাগে গর্ত্ত করে না। ইহাদের নীড়ের প্রবেশ পথটী থাকে ডালের তলদেশে। বড় বড় গাছের মাঝারি ডালগুলির নীচের দিকে যে ফুটাগুলি দেখা যায় সেগুলি "বসন্ত" পাখীর নীড় রচনার ফল। বৃষ্টির জল যাহাতে নীড়মধ্যে প্রবেশ না করে সেইজন্যই

ইহারা বৃক্ষশাখার অধোভাগে কোটরের প্রবেশ পথ তৈয়ারী করে। কাঠঠোক্‌রা গাছের খাড়া কাণ্ডে কোটর প্রস্তুত করে বলিয়া তাহাদের এ সমস্যা নাই। বসন্ত পাখীর খাড়া ডালে নীড় রচনা করার অভ্যাস নাই। ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল ডালগুলিতেই এরা নীড় প্রস্তুত করে বলিয়া ইহাদিগকে ডালের তলদেশে নীড়ের প্রবেশ দ্বার রাখিতে হয়। ইহারা এক একবারে দুইটী হইতে চারিটী পর্য্যন্ত শুভ্রবর্ণের ডিম পাড়ে।

সাধারণতঃ পাখীরা একবার যে গাছের যে স্থানে নীড় রচনা করে, পরবৎসর যে সেই গাছের সেই স্থানে নীড় রচনা করিবে তাহা নহে। যদিও কতকগুলি পাখীর চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিন্তু যে সব পাখী বৃক্ষ বা দেয়ালের গর্ত্তে বাসা প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে উপর্য্যুপরি একই গর্ত্তে নীড় নির্ম্মাণ করিতে দেখা যায়। দোয়েল ও হুপোকে আমি এরূপ করিতে দেখিয়াছি। "বসন্ত" পাখীও তাহাই করে। প্রতি বৎসর কাষ্ঠ খোদনের পরিশ্রম কি সাজে? শুধু তাহাই নহে, পাখীদের শাবক সাবালক হইয়া জনকজননীর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, পক্ষীদম্পতিও নীড়টি পরিত্যাগ করে এবং বৃক্ষশাখাই সর্ব্বসময়ের জন্য আশ্রয় করে। "বসন্ত" পাখী কিন্তু কোটরটী পরিত্যাগ করিয়া যায় না। প্রজনন ঋতুর পরও শাবকরা যখন স্বাবলম্বী হইয়া জনক-জননীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখনও বসন্ত-দম্পতি ঐ বৃক্ষ-কোটর মধ্যেই নিশাযাপন করিয়া থাকে। পাখীদের চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য বিরল।

খঞ্জন

খঞ্জন সংস্কৃত সাহিত্যে কবিদের অতিশয় প্রিয় পাখী। নারী-সৌন্দর্য্যের উপমা আবিষ্কারে সংস্কৃত কবিরা ছিলেন অদ্বিতীয়; এবং নারীর নয়নে তাঁরা খঞ্জনের সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। আকৃতিসাদৃশ্যে কি প্রকৃতিসাদৃশ্যে এই উপমার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিতে পারি না। প্রায় পঁচিশ বছর পূর্ব্বে খুব সম্ভবতঃ "ভারতী" পত্রিকাতে আচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর নারী সম্বন্ধে সংস্কৃত উপমা-গুলি চিত্রসাহায্যে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে খঞ্জনের সুঠাম অবয়বের গঠনাকৃতির সহিত চোখের গড়ন তুলনীয়। কিন্তু আমার মনে হয় যে কারণে কোনও কোনও রমণীকে সফরীনয়না বলা হয়, সেই কারণেই সদাচঞ্চল এই পাখীটির অস্থির প্রকৃতির জন্য নারীবিশেষের নয়নকে খঞ্জন-নয়ন বলা হইয়াছে, এরূপও হইতে পারে।

সে যাহা হউক, একথা সত্য যে এই পাখীর দেহের গঠন-পরিপাট্য যে কোনও রেখাচিত্রকরের চিত্ত আকর্ষণ না করিয়া পারে না। সব পাখীর গড়ন মনোহর নহে। যেমন "বসন্ত বাউরী" বা "ছাতারে"। প্রথমটি বেঁটে, দ্বিতীয়টি ট্যাপ্‌সা। অথচ দোয়েল, ফিঙে প্রভৃতি পাখীর অবয়ব কেমন সুঠাম। খঞ্জনের গঠনও সেইরূপ। আকৃতির সৌন্দর্য্যের সহিত সমতা রক্ষা করিয়াই প্রকৃতিও লালিত্যপূর্ণ। ইহাদের দেহ বোধহয় আয়তনে চড়ুই পাখীর মত, কিন্তু দীর্ঘ পুচ্ছটির জন্য তদপেক্ষা বৃহত্তর দেখায়। এই পুচ্ছটি অনবরত চলিতে ফিরিতে উর্দ্ধ অধঃ দোলায়মান হয়। যতক্ষণ এই পাখী ভূমির উপর বিচরণ করে ততক্ষণ লেজটি কম্পায়মান হওয়ায় ইহাকে সব সময় নৃত্যপরায়ণ বলিয়া মনে হয়। এই লক্ষণ হইতেই ইহার ইংরাজী নাম হইয়াছে "ওয়্যাগটেল"।

ইহারা কীটভুক পাখী এবং বেশীর ভাগ খঞ্জন জলসান্নিধ্যেই আহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। তবে ইহাদের মধ্যে দুই একটি জাতি আছে যাহাদিগকে জলাশয় হইতে দূরে, লোকালয়ের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায়। ইহারা বৃক্ষশাখার খুব কমই ধার ধারে। ধরিত্রীপৃষ্ঠই প্রধানতঃ ইহাদের লীলাক্ষেত্র। উড়ন্ত পতঙ্গের পিছনে

খঞ্জন

ইহারা যখন ধাবমান হয় তখন ইহাদের গতি বেশ ক্ষিপ্র, কোথাও বিন্দুমাত্র জড়তা বা আড়ষ্টতা নাই। আবার ডানার উপর ভর করিয়া সে যখন শূন্যপথে গমন করে তখন ইহার উৎপতন ভঙ্গিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। ইহারা সোজা সরল রেখা ধরিয়া উড়ে না। উঠিয়া

৯২ পৃঃ

ছোট বসন্ত
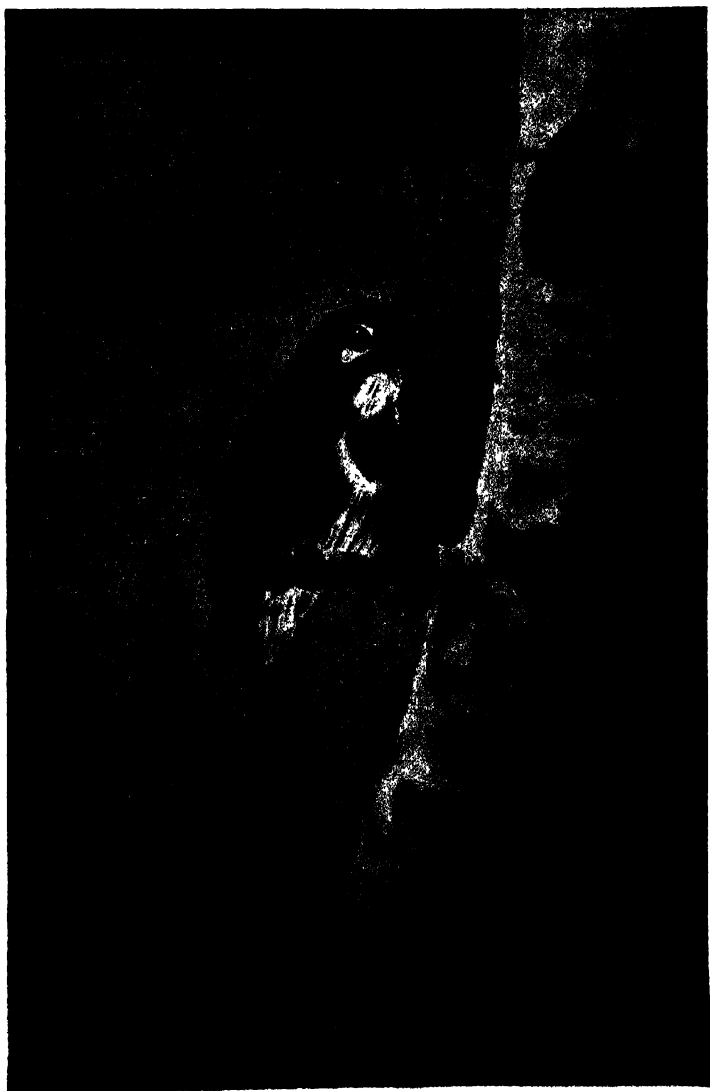
পড়িয়া দোল খাইতে খাইতে ওড়ে, মনে হয় বাতাসে ঢেউয়ের উপরে ভাসিয়া চলিয়াছে। ইহার উড়িবার রীতি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এই পাখীটির ডানাদ্বয় খুব শক্তিশালী। তাহার কারণ আছে।

বাংলাদেশে আমরা যে সব খঞ্জন দেখি, তাহারা এদেশের অধিবাসী নহে। শীতকাল মাত্র ইহারা আমাদের দেশে যাপন করে। কোকিল, দোয়েল বা বসন্ত পাখী যেমন আমাদের বসন্ত ঋতুর বার্ত্তাবহ তেমনি খঞ্জন ও ইহার পরে বর্ণিত "বাঁশপাতি", ইহারা হিমঋতুর বার্ত্তাবহ। এই দুইটি পাখী যেদিন দেখিতে পাইবেন, সেইদিনই বুঝিবেন হৈমন্তিক বাতাস সুরু হইয়াছে এবং কিঞ্চিৎ গরম কাপড় অঙ্গে চড়ানো প্রয়োজন, নইলে ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি সভ্য পীড়া ধরিতে পারে। যদি ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় সাবধানতা অবলম্বন করিতে চান, এই পাখীদের দিকে লক্ষ্য রাখিলে কখনও ভুল হইবে না। ঋতু পরিবর্ত্তন বুঝিবার একটা অশিক্ষিতপটুত্ব বা সহজবুদ্ধি পশুজগতের অধিবাসীদের স্বাভাবিক। তন্মধ্যে পাখীদের আবার ইহার বোধশক্তির মাত্রাটা যেন সমধিক।

কোকিল ও বসন্ত পাখী ভারতবর্ষেরই বাসিন্দা। কোকিল যদিই বা কোথাও হাওয়া বদলাইতে যায়, দেশ ছাড়িয়া সে যায় না। বসন্ত বাউরী বেচারী একেবারেই কেরাণী মানুষ কোথাও বেড়াইতে যাইবার সঙ্গতি তাহার নাই। কেরাণী বাবু (রেলের না হইলে) আর্থিক সঙ্গতির অভাবে দেশভ্রমণে অপারগ। বসন্ত বাউরী বেচারীর শারীরিক সঙ্গতির অভাব। খঞ্জন ও বাঁশপাতি ইহারা ভারতের বাহিরে উত্তরপথ হইতে আগমন করে এবং আমাদের ভূতপূর্ব্ব বিলাতী শাসনকর্ত্তাদের মতই এদেশে স্বল্পকালবিহারী। তবে ঐ বিলাতী পুরুষেরা আমাদের ভীতি ও অস্বস্তির কারণ হইয়া থাকিতেন। কিন্তু খঞ্জন ও বাঁশপাতি আমাদের দাসত্বকুণ্ঠিত মনে কিঞ্চিৎ আনন্দ, হর্ষ ও সজীবতা সঞ্চার

করিত। ইহাদের ডানা হুইটি যদি শক্তিশালী না হইত তবে বহুশত যোজনপথ অতিক্রম করা সহজ হইত না।

শরৎ কালের শেষ হইতে পাঠক পাঠিকাকে লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করি। হঠাৎ একদিন আপনার বাড়ীর পাশের মাঠে বা পুকুরের ধারে কিংবা জলাশয়তীরে এই ছোট্ট পাখীটি দেখিবেন পুচ্ছ আন্দোলিত করিয়া আপনাকে অভিনন্দন করিতেছে ; বলিতেছে—"এ দেশ লেগেছে ভাল নয়নে"। তখন তাহাকে দেখিয়া বুঝিতেও পারিবেন না, যে সেই রাত্রিতে বহুশত যোজন পথ অতিক্রম করিয়া আপনার গ্রামপ্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছে এবং সেইখানেই থাকিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। তাহার চলনে, ভঙ্গীতে, ইঙ্গিতে কোথাও ক্লান্তি বা অবসাদের লক্ষণ মাত্র নাই। ইহার মৃত্যু, মিহি স্বরটি বড় মিষ্ট। অর্থাৎ সব দিক দিয়া বিচার করিলে ইহার মত হর্ষ ও আনন্দের প্রতীক জীব খুব কমই দেখা যাইবে।

ঠিক যখন খঞ্জন আসিয়া পৌঁছায় প্রায় একই সময়ে "বাঁশপাতি"ও এদেশে পৌছায়। ইহারা জানাইয়া দেয় হিম আসিতেছে, সাবধান হও। আবার যদি লক্ষ্য রাখেন, দেখিবেন ইহাদের প্রত্যাগমনের তারিখটা প্রায় প্রতি বৎসর একই সময় হইয়া থাকে। দুই একদিনের পার্থক্য হইতে পারে। সেটা তিথি ও নক্ষত্রের অগ্রপশ্চাৎ হওয়ার জন্য, মাস বা পক্ষের ব্যতিক্রম হয় না।

খঞ্জনের রূপবর্ণনা করা একটু শক্ত। ইহাদের দেহে সাদা ও কালোরঙের বিচিত্র সমাবেশই বেশী। তবে দেহের অধোভাগে একটু হলুদের ছোপ আছে। তাও আবার সকলের নহে। সাদা কালোর সংস্থান অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পালকগুলি অহরহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় সুতরাং হয়তো পালকের অগ্রভাগ একসময় সাদা দেখা গেল। কিছুদিন পরে ঐ সাদা অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া তাহার অব্যবহিত পরের কালো অংশ পালকের অগ্রভাগের বর্ণ রূপে দেখা দিল।

পশ্চিম ভারতে একটু বৃহত্তর একজাতীয় খঞ্জন আছে। যাহার বর্ণবিন্যাস অনেকটা দোয়েলের মতো। সেই পাখীটির সঙ্গীত খুব মিষ্ট ও মনোহর এবং সে যাযাবর নহে ভারতেরই অধিবাসী। সে জলের ধারেও থাকে, আবার আমাদের গৃহচূড়ায় আসিয়া উপবেশন করে। খঞ্জন মনুষ্য লোকালয়ের নিকটেও থাকে, দূরে নদী বা জলাশয় প্রান্তেও থাকে। উন্মুক্ত স্থানেই ইহারা বিচরণ করে। বনে জঙ্গলে ইহারা যায় না। ইহাদের কণ্ঠসঙ্গীত সুর সমন্বিত। সেইজন্য ইহা খাঁচার পাখী হিসাবে সমাদৃত। বাঙ্গলার পশ্চিম সীমান্তের জেলাগুলিতে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহারা কীটভুক পাখী হইলেও অসামাজিক নহে, অনেকগুলিকেই একত্র দেখা যায়। অসামাজিক হইলে মরুকান্তার পার হইয়া শতশত যোজন পথ যাহাদের অতিক্রম করিতে হয় তাহারা একাকী এত দূরপথের বিঘ্নবিপদের সম্মুখীন হইতে সাহস পায় না। দলবদ্ধ হইয়াই তাহাদের চলিতে ফিরিতে হয়। সুতরাং কীটভুক্ পাখী হওয়া সত্ত্বেও খঞ্জন সামাজিক পাখী। একথাটা কবি কালিদাসও জানিতেন। প্রাকৃতিক জগতের জ্ঞান তাঁহার খুব নির্ভুল ছিল বলিয়াই তিনি সুনিপুণ উপমাবিশারদ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। অসম্ভব কিছু দর্শন করিলে দর্শক ভাগ্যলাভ করে এরূপ একটা বিশ্বাস সব সমাজেই প্রচলিত। তাই কালিদাস একস্থানে বলিয়াছেন যে নলিনীদলমধ্যে খঞ্জনকে যে একাকী দেখিতে পাইবে সে রাজা হইবে।

"একোহি খঞ্জন বরো নলিনীদলস্থো
দৃষ্টঃ করোতি চতুরঙ্গ বলাধিপত্যম্।
কিং বা করিষ্যতি ভবদ্বদনারবিন্দে
জানামি নো নয়ন খঞ্জনযুগ্মমেতৎ॥"

কবি বলিতেছেন যে পদ্মদলমধ্যে যদি কেহ একটি মাত্র খঞ্জন দেখিতে পায় (কেননা একাধিক খঞ্জনই সব সময় দেখা যায়) তবে সে ব্যক্তি চতুরঙ্গ সেনাধিপতি হইয়া থাকে। তোমার বদন অরবিন্দে দুটি খঞ্জন দেখে আমার ভাগ্যে কি হবে কি জানি!

বাঁশপাতি

এই পাখীটাও আমাদের পল্লীপ্রান্তের সুষমা বৰ্দ্ধন করে। কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে বাসকালে লক্ষ্য করিয়াছি যে প্রায় খঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা আসিয়া উপস্থিত হইত। ইহারা আংশিক যাযাবর কিংবা সম্পূর্ণ যাযাবর তাহা সঠিক আমি বলিতে পারি না। তবে আমাদের গ্রামে ইহাকে শীতের প্রারম্ভেই আসিয়া ভরা গ্রীষ্মের সময় অন্তর্হিত হইতে দেখিতাম। বাংলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে ইহাকে আমি গ্রীষ্মকালে দেখি নাই।

খাস কলিকাতা সহরে গড়ের মাঠে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কার্জন পার্কের পশ্চিম প্রান্তের গাছগুলি হইতে বাহির হইয়া দ্রুত সঞ্চরমান কীটপতঙ্গের পশ্চাদ্ধাবমান হইতে ইহাদিগকে বহু বৎসর লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাদের উড়িবার ক্ষিপ্রতা ও উড়ন্ত অবস্থায় কীটপতঙ্গ ধরিবার রীতি ফিঙের মত।

ইহাদের নাম হইতেই ইহাদের দেহবর্ণ অনুমেয়। উহা কচি বাঁশের পাতার মত সবুজ। তবে পৃষ্ঠে, মাথায় ও ডানায় অগ্রভাগে লালচে পীত আভা থাকায় যখন ইহা নানা ভঙ্গীতে উড়ন্ত কীটপতঙ্গের পশ্চাতে ধাবমান হয় তখন সূর্য্যালোক ইহার দেহে নিপতিত হইয়া বিচিত্র বর্ণের আভা সৃষ্টি করে। গণ্ডদেশ উজ্জ্বল নীল। চঞ্চুটী ঘন কৃষ্ণ। চঞ্চুর মূলদেশ হইতে একটী সুপরিসর ঘনকৃষ্ণ রেখা চক্ষুর নীচ দিয়া ঘাড়ের দিকে চলিয়া আসিয়াছে। গলা ও বক্ষের সংযোগস্থলে একটী সঙ্কীর্ণ কালো রেখা কণ্ঠহারের মত দেখা যায়। চক্ষু উজ্জ্বল লাল। সুতরাং বিবিধ বর্ণের সমাবেশে ইহাকে দেখিতে মনোহর। ইহাদের পুচ্ছের গঠন এই মনোহারিত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। পুচ্ছের মাঝখান হইতে

সরু দুটী কৃষ্ণবর্ণের সূচ্যগ্রভাগ পালক লেজ ছাড়াইয়া দুই ইঞ্চি বাহির হইয়া থাকে। সুতরাং এই হরিদ্বর্ণ, ক্ষিপ্র, চঞ্চল অদ্ভুত পুচ্ছবিশিষ্ট পাখীটাকে চিনিতে কাহারও অসুবিধা হইবার কথা নয়। যে রেখাছবি
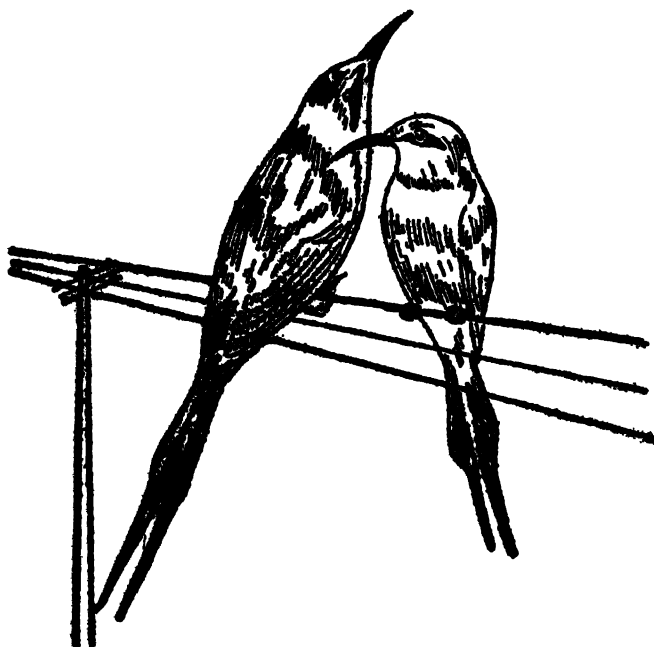
বাঁশপাতি

এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা ইহাকে চিনিয়া লওয়া, আশা করি, সহজ করিয়া দিবে।

খন ভূমির উপর ছুটাছুটী করিয়া কীটপতঙ্গ পাকড়াও করে, বাঁশ-

পাতি ভূমির উপর বড় একটা আসে না। সে উড্ডীয়মান অবস্থায় তাহার খাদ্য শিকার করে, সেই জন্য পলায়মান কীটপতঙ্গের পশ্চাদ্ধাবন কালে দ্রুতগতি এপাশ ওপাশ ও ডিগবাজী খাইতে ইহাকে অহরহ দেখা যায়। ভূমির অতি নিকটে আসিয়া তৃণ-শস্যাদির শীর্ষদেশ হইতেও সে উড়ন্ত অবস্থাতেই পতঙ্গ ধরে। ফিঙ্গেরাও ইহারই মত উড্ডীন অবস্থায় শিকার ধরে; কিন্তু প্রয়োজন হইলে মাটীতে আসিয়া বসিতে দ্বিধা বোধ করে না, যদিও তাহার দীর্ঘপুচ্ছটী কিঞ্চিৎ অসুবিধার সৃষ্টি করে। কিন্তু বাঁশপাতি আদৌ মাটির উপর উপবেশন করে না। ইহাদের পদাঙ্গুলী যুগ্ম হওয়াতে বোধ হয় মাটীতে বসিতে ইহারা পারে না। সুতরাং মাঠের মধ্যে যে দুই একটী বৃক্ষ থাকে তাহার পত্রবিরল ডালের উপরই ইহারা বিশ্রাম করে। কানন মধ্যেও প্রবেশ করে না আবার গাছের ভিতরও যায় না। মুক্তস্থানই এদের বিচরণ ক্ষেত্র। আবার খঞ্জনের মত মনুষ্যসান্নিধ্য পরিহার করিয়া চলার কথা ইহারা মোটেই ভাবে না।

ইহারা নাকি মৌমাছি খায় কেন না ইহাদের ইংরাজি নাম "গ্রীণ বী-ইটার"। তবে একমাত্র মৌমাছিই ইহাদের ভক্ষ্য নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে ইহাদিগকে আমরা সুনজরে দেখিতে পারিতাম না কেননা, মানুষের একটী অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য, মধু, সঞ্চয় করে বলিয়া মৌমাছি মানুষের মিত্রস্থানীয়। উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে ইহাদের বিচরণ ক্ষেত্রের একটু বৈচিত্র্য আছে। উড়ন্ত অবস্থায় শীকার ধরিতে হয় বলিয়া ইহারা পল্লবনিবিড় কানন মধ্যে থাকিতে পারে না। আবার উন্মুক্ত প্রান্তরও ইহাদের বাসোপযোগী নহে। তাই বাগানের প্রান্তে যেখানে খানিকটা খোলা স্থান আছে সেই স্থানই ইহাদের প্রিয় আড্ডাস্থান। বৃক্ষাদির নাতিউচ্চ ডালগুলিতে যাইয়া ইহারা বসে এবং সেখান হইতে শূন্যপথে নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া পতঙ্গের

পশ্চাদ্ধাবন করে। বৃক্ষহীন মুক্ত প্রান্তর সেইজন্য ইহাদের পক্ষে অনুপযোগী। রেল লাইনের ধারে ধারে টেলিগ্রাফের তার সেইজন্য ইহাদের অতি প্রিয়। ঐরূপ স্থানে বসিয়া—উড্ডীয়মান কীটপতঙ্গাদি লক্ষ্য করা অতি সুবিধাজনক। এই পাখীগুলিও কীটভুক্ হওয়া সত্বেও একাকী বিচরণ করে না, অনেকগুলি দলবদ্ধ হইয়াই থাকে।

পশ্চিমভারতের কোনও কোনও স্থানে বোধহয় ইহারা যাযাবর নহে। বাংলা দেশেও কোনও স্থানে ইহারা স্থায়ী বাসিন্দা কিনা বলিতে পারিনা। এই সকল তথ্য অবগত হওয়া যায় যদি বিভিন্ন জেলায় কৌতূহলী পর্য্যবেক্ষক ইহাদের আনাগোনা লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। ইহাই হইল "নেচার ষ্টাডি" বা প্রকৃতি পরিচয়। ইহার জন্য কাহাকেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজ্ঞ হওয়ার আবশ্যক করে না। প্রাণীতত্ত্বে অবৈজ্ঞানিকের নেচার ষ্টাডি নোটস্ বৈজ্ঞানিক গবেষণার সহায়তা করে।

ধূলিস্নান করিয়া দেহ পরিষ্কার রাখা ইহাদের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শূন্যবিহারী এই পাখী সাধারণতঃ ধরিত্রীপৃষ্ঠে অবতরণ না করিলেও ধরণীর ধূলা অঙ্গে মাখিতে ভালবাসে। হুপো, চড়াই ভরত, প্রভৃতি পাখীও ধূলিস্নান করিতে পটু, ইহা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি।

নীড় রচনা কার্য্যও ইহারা ধরিত্রীর ক্রোড়েই সম্পন্ন করে। একজন্য বৃক্ষের আশ্রয় ইহারা লয় না। মাঠের ধারে কোনও উচ্চ পাড়ে বা কোনও বাঁধের ধারে ইহারা গাঙশালিকের ন্যায় গর্ত্তমধ্যে নীড় স্থাপন করে।

নীড়ের জন্য ইহারা স্বয়ং নখর ও চঞ্চুর দ্বারা গর্ত্তখনন করিয়া লয় এবং প্রায় ২ হইতে ৪ হাত দীর্ঘ সুড়ঙ্গ করে। ইহাদের নীড়-রচনার পদ্ধতি লক্ষ্য করিবার মত; চঞ্চুর দ্বারা খানিকটা গর্ত্ত করিয়া

লয় তারপর ভিতরে চঞ্চুদ্বারা খনন করিতে করিতে অগ্রসর হয় এবং আলগা মাটি পদদ্বয় দ্বারা পশ্চাদ্দিকে ছুঁড়িয়া দিতে থাকে। ইহাদেরও ডিম সাদা। মার্চ্চ এপ্রিলে ইহারা নীড়রচনা শাবকোৎপাদন কার্য্য সমাধা করে।

পাখীর কথা

এই পুস্তকে কয়েকটি মাত্র পাখীর বর্ণনা সন্নিবেশিত হইল। অবিভক্ত ভারতবর্ষে প্রায় ১২০০ রকমের পাখী আছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব শাসকরা আমাদের জন্য কোনও উপকার না করিলেও আমাদের দেশের অনেক প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে এ দেশের পাখীর বংশপরিচয় একটি। ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থানুকূল্যে এদেশের বিবিধ জীবজন্তু ও উদ্ভিদাদির বিশদ বর্ণনা, শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি মুদ্রিত হইয়াছে। "ফণা অফ বৃটিশ ইণ্ডিয়া, বার্ডস" প্রথমে ব্ল্যানফোর্ড এবং ওট্‌স্‌ এই দুই মনীষী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বাহির হয়। তারপর গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই সুবৃহৎ গ্রন্থগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ ষ্টুয়ার্ট বেকারের সম্পাদনায় বাহির হয়। প্রথম সংস্করণের শ্রেণীবিভাগের অনেক পরিবর্ত্তন ষ্টুয়ার্ট বেকার করেন।

ইহা ছাড়া বহু ইংরাজ লেখক এদেশের পাখী সম্বন্ধে গবেষণা-মূলক বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। অনেকে আবার অবৈজ্ঞানিক সাধারণ পাঠকের জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় পাখীদের জীবনকাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। বাংলা ভাষায় বিশ্বভারতীর শিক্ষক ৺জগদানন্দ রায় মহাশয় "বাংলার পাখী" নামে একটি পুস্তিকা ছেলেদের পাঠ্য হিসাবে মুদ্রিত করেন। বড় ও ছোট সকলের পাঠযোগ্য পুস্তক পাখী সম্বন্ধে আর কেহ রচনা করেন নাই।

আজ আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে এবং এ দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। ইউরোপীয় জাতিদের অপরিসীম হিংসাত্মক ও লোভী মনোবৃত্তি

তাহাদের তথাকথিত সভ্যতাকে শ্বাপদচরিত্রের রূপ দান করিয়াছে। সেইজন্য তাহারা মারণাস্ত্রের অনুসন্ধান ও আবিষ্কারে সুপটু। যে জাতি তাহাদেরই মত অস্ত্রবলে বলীয়ান ও সামরিক বৃত্তিতে নিপুণ নহে, অধুনা জগতে সে জাতির স্বাধীন অস্তিত্বের কোনও মূল্য নাই। এশিয়া ভূখণ্ডের একমাত্র জাপানীরা শিক্ষাদ্বারা সামরিকবুদ্ধি প্রখর করিয়া তুলিয়াছিল।

ভারতবর্ষে আজ সামরিক, নাবিক ও অন্যান্য বিভাগে বহু সুদক্ষ লোকের প্রয়োজন হইবে; কিন্তু আমাদের ছেলেদের মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি যদি বৃদ্ধি না করা যায় তবে এই সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব হইবে। ইংরাজ এদেশে থাকিতে গত ত্রিশ বৎসরে শিক্ষা-পদ্ধতিকে এমন একটা রূপ দান করিয়া গিয়াছে যে আমাদের ছেলেদের মধ্যে চপলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, চিন্তার গভীরতা হ্রাস পাইয়াছে। কেননা, বিদ্যালয়ে ও শিক্ষায়তনে শিক্ষার ভড়ংকে প্রাধান্য বেশী দেওয়া হইয়াছিল।

"নেচার ষ্টাডি" বা প্রকৃতি-পরিচয় এদেশের প্রত্যেক স্কুলের পাঠ্য মধ্যে স্থান পায়। কিন্তু এই দরিদ্র দেশে সহজে, অল্প খরচে অথচ যথেষ্ট আনন্দবর্দ্ধকভাবে প্রকৃতি-পরিচয় শিক্ষালাভের চেষ্টা নাই। পক্ষী পর্য্যবেক্ষণ যদি প্রতি বিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকায় স্থান পায় তবে, অল্প খরচে প্রত্যেক স্কুলেই ছেলেরা শুধু যে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিতে শিক্ষিত হইতে পারে তাহা নহে, তাহাদের চিত্তের স্থৈর্য্য, চিন্তা করার শক্তি ও দৃষ্টির গভীরতা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

অবশ্য এজন্য শিক্ষকদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে জুওলজীতে ওস্তাদ হইতে হইবে না। বাংলা দেশে কৌতূহলী শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের জন্য পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আতিশয্যবর্জ্জিত বই পাখী সম্বন্ধে নাই। এই পুস্তকটি সেই অভাব পূরণের একটা প্রয়াস মাত্র।

পাখীর শ্রেণীবিভাগের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণভাবে যদি আমরা পাখীর শ্রেণীবিভাগ করিতে যাই তাহা হইলে হয়তো নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করিতে চেষ্টা করিব—

(১) মাঠের পাখী : এর মধ্যে আমরা সাদা বক, ফিঙ্গে, হুপো, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি দেখিতে পাই। শালিক, কাককেও মাঠে দেখা যায়। গ্রামদেশে দাঁড়কাককে তো প্রায়ই দেখা যায়।

(২) গাছের পাখী : বসন্ত বাউরী, হলদে পাখী, হাঁড়িচাচা, কোকিল প্রভৃতি গাছে গাছেই থাকে। সুতরাং এদের গাছের পাখী বলিতে দোষ কি ?

(৩) জলের পাখী : হাঁস, ডাহুক, জলপিপি, ডুবুরী, মাছরাঙা খঞ্জন, কাদাখোঁচা এদের জলের উপর বা পাশেই দেখা যায়।

(৪) ঘরের পাখী : চড়ুই, কাক, পায়রা, দোয়েল, বুলবুল, শালিক—এরা আমাদের ঘরের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় সুতরাং ঘরের পাখী বলিতে আপত্তি কেন হইবে ?

(৫) শিকারী পাখী : বাজ, চিল, পেচক—প্রভৃতি আমিষ-ভোজী পাখীকে শিকারী পাখী বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এরূপ শ্রেণীবিভাগ কি খুব সঙ্গত হইবে? ধরুন, বুলবুল ও দোয়েল—এদের ঘরের পাখীও বলিতে পারি আবার বনের পাখীও বলিতে পারি। শালিক, ঘুঘু, কাক এদের ঘরের পাখী, বনের পাখী, মাঠের পাখী, তিনটাই বলা চলে। খঞ্জন জলের ধারের পাখী, মাঠেও চরে আবার আমাদের গৃহপ্রাঙ্গনেও আসিয়া বেশ হৃষ্টমনে চলাফেরা করে।

সুতরাং এই শ্রেণীবিভাগদ্বারা পাখীদের ঠিক কুলের পরিচয় পাওয়া যায় না। ছোট ছেলেদের শিক্ষাদান কালে অবশ্য এইরূপ একটা

শ্রেণীবিভাগ করিয়া তাহাদের ঔৎসুক্য ও কৌতূহল জাগ্রত করিতে পারি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ করিতে হইলে আরও গভীরতর পার্থক্যগুলি বা শ্রেণীবিভাগের মূলসূত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে হইবে।

এই পুস্তকে আপাতঃ দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও কয়েকটি পাখীকে একই বংশের বলিয়া দুই এক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কাণাকুয়া পাখী দেখিতে বেশ বড় একটা দাঁড়কাকের আয়তনের। অনেকে একে কাকের গোত্রসম্ভূত বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিবেন না। অথচ আমি ইহাকে কোকিলের মধ্যে স্থান দিয়াছি।

হাঁড়িচাচার বর্ণবৈচিত্র্য ও দীর্ঘ পুচ্ছ হইতে কে ইহাকে বায়সের জাতি বলিয়া সন্দেহ করিবে? অথচ বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগে— উভয়েই এক বংশের।

৺জগদানন্দ রায় মহাশয়ের যে পুস্তকের নাম করিয়াছি তাহাতে তিনি এ দেশে দুই রকমের কাঠঠোকরা আছে বলিয়া হুপোর নাম করিয়াছেন ও তাহার ছবি দিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের কাছে কিন্তু ইহারা বিভিন্ন পাখী।

বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগের জন্য শরীরগঠনের উপর অধিকতর নির্ভর করেন। সুতরাং চোখে দেখিয়া কোনও পাখীর শ্রেণীবিচার করিতে হইলে, সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন হয়। এই কঠোর বিষয়টির এই পুস্তকে অবতারণা করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রেণীবিভাগের মত জটীল বিষয় ছাড়িয়া দিলেও বিহঙ্গ জীবনের এমন কতকগুলি দিক আছে—যাহা অতীব রহস্যময়।

পাখী ওড়ে কি করিয়া? পাখী গান গায় কি জন্য? পাখীর বর্ণবৈচিত্র্য কি প্রকৃতির খেয়াল মাত্র? পাখীর প্রকৃতি কি সহজাত না শিক্ষানবিশীসাপেক্ষ? পাখীর দাম্পত্যজীবন কোন রীতি বা নীতি

মানিয়া চলে? ইহারা কি প্রতি বৎসর নিজ নিজ সঙ্গী বা সঙ্গিনী গ্রহণ করে না, এক একজোড়া স্ত্রীপুরুষ সারাজীবনের জন্ম মিলিত হয়? পাখীরা ঘুমায় কি করিয়া? গাছের ডালে বসিয়া যে সব পাখী নিদ্রা যায় তাহারা পড়িয়া যায় না কেন? শিশু ও বালকবালিকার কৌতূহলী মনে এই সব প্রশ্ন তুলিয়া তাহার সমাধান করিবার চেষ্টা করিলে তাহাদের শুধু যে আনন্দ দান করা হইবে তাহা নহে, তাহাদের চিত্তকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণক্ষম করিয়া তোলা যাইতে পারে।

উক্ত বহুপ্রকারের সমস্তা ছাড়িয়া দিলেও—পাখীর জীবনের বিচিত্রতম ব্যাপার তাহার যাযাবরত্ব। সে এক ঋতুতে এক দেশে আসিয়া খায় দায়, গান করে আবার অন্য ঋতুতে কোনও কোনও পাখী ৩।৪ হাজার মাইল দূর দেশে যাইয়া বাসা রচনা করিয়া সন্তান উৎপাদন করে। ইহা বিহঙ্গ জীবনের আশ্চর্য্যতম ব্যাপার। মার্কিন দেশে পাখীর যাযাবরত্ব সম্বন্ধে গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণ যথেষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষের পাখী সম্বন্ধে সামান্তই জ্ঞান আমাদের আছে।

মার্কিন দেশে জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত তীব্র। এই নবীন জাতি নানাদিকে নিজেকে সমৃদ্ধ করিতে তৎপর, যাহার ফলে আজ সে বিশ্বসাম্রাজ্য দাবী করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। পাখীর যাযাবর জীবনের সম্যক গবেষণা ইহাদের মধ্যে হওয়ার আর একটা কারণ আছে। ইউরোপীয় দেশের অধিবাসী হইতেই আজ মার্কিনজাতি উদ্ভূত। ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক মার্কিন আবিষ্কারের মূলে রহিয়াছে যাযাবর পাখী।

জগদ্বিখ্যাত পোত-পরিচালক কলাম্বস অঙ্ক কষিয়া ইউরোপের পশ্চিমে সমুদ্রপারে এক মহাদেশ আছে স্থির করিয়াছিলেন। বহু কষ্টে জাহাজ জোগাড় করিয়া তো তিনি অসীম সমুদ্রে ভাসিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁর অধীন নাবিক মাঝিমাল্লারা ঠিক করিল যে

এই উন্মাদের পাল্লায় পড়িয়া তাদের মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। তাহারা অনুনয় বিনয় করিল। বলিল—"দেশে ফিরিয়া চল—নহিলে এই অকূল সমুদ্রে স্রেফ প্রাণটাই হারাইব।" কলাম্বস তাহাদের ধৈর্য্য-ধারণ করিতে বলিলেন। কিন্তু মাসাবধি যাহারা জল ছাড়া কিছু দেখিতে পায় নাই—জাহাজের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে যারা বন্দী—টাটকা আহারের অভাবে যারা ব্যাধিগ্রস্ত—তাহারা শুনিবে কেন? সুতরাং তাহারা ষড়যন্ত্র করিল কলাম্বসকে বন্দী অথবা প্রয়োজন হইলে হত্যা করিতে হইবে। এই সময় এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল কতকগুলি পাখীর আবির্ভাবে। পাখীগুলি জলচর নহে তাহা সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাহাদের দেখিয়া নাবিকদের মনে আশা হইল যে শ্যামলতৃণশষ্প-শোভিত ধরিত্রী নিশ্চয়ই সন্নিকটে। পোতাধ্যক্ষ তবে উন্মাদ নহে। তাহারা আবার আশায় উৎফুল্ল হইল। মার্কিন দেশের ইতিহাস-লেখক ফ্র্যাঙ্ক চ্যাপম্যান বলেন যে, পাখীর সাহায্য না হইলে কলাম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার করা হইত না। আবার কলাম্বস আমেরিকার মহাদেশে যে পদার্পণ করিতে পারেন নাই, পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তাহাও পাখীদের জন্যই। প্রথম কয়েকদিন কতকগুলি পাখী জাহাজের মাস্তলে ও পালের দড়িতে সকাল বেলা আসিয়া বসিত ও তাহাদের সঙ্গীতে জাহাজের মাঝিমাল্লাদের প্রাণে আনন্দসঞ্চার করিত। সন্ধ্যাবেলা তাহারা উড়িয়া চলিয়া যাইত। ধরিত্রীর দর্শন পাইবার তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে পাখীরা উত্তর হইতে আসিত ও দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রয়াণ করিত। কলাম্বসের জাহাজ পশ্চিম মুখেই চালিত হইতেছিল। সহসা তাঁহার মনে হইল যে পাখীদের একটা নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যস্থান নিশ্চয়ই আছে এবং পাখীরা যেদিকে যাইতেছে সেই দিকে গেলে ডাঙ্গা সুনিশ্চিত পাওয়া যাইবে। সুতরাং পাখীদের তিনি পাইলট বা জাহাজের দিগদর্শক হিসাবে গণ্য করিয়া

দক্ষিণ-পশ্চিম্ মুখে জাহাজ চালাইলেন এবং সাতদিন পরই তিনি এই বিধাতৃদত্ত পাইলটের সাহায্যে ডাঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদি তিনি সোজা পশ্চিম দিকেই চলিতেন তবে মেক্সিকোর ভূমিতে উপস্থিত হইতে পারিতেন।

চ্যাপম্যান সাহেব বলেন যে কতকগুলি পাখীর দক্ষিণাপথ যাত্রায় বেরমুডা দ্বীপপুঞ্জ হইতেছে একটা "ষ্টেশন" বা বিশ্রাম স্থান। এইসব পাখী মেক্সিকো উপসাগরে আসিয়া দক্ষিণপশ্চিমে বাহামা দ্বীপপুঞ্জ হইয়া তারপর আরও দক্ষিণে যায়। তাহাদের যাত্রাপথে কলম্বাসের জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় এই পাখীদের অনুসরণ করিয়া কলম্বাস বাহামা দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি পালোস সহর হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বর রওনা হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি যদি আর দশদিন দেরী করিয়া রওনা হইতেন তবে আর পাখীর দর্শন পাইতেন না। কেননা তৎ-পূর্ব্বেই পাখীর শেষ ঝাঁক পার হইয়া চলিয়া যাইত এবং সেরূপ হইলে কলম্বাস নাবিকদের বিদ্রোহ থামাইতে পারিতেন না। ফলে হয়তো আমেরিকা আবিষ্কৃত হইত না—পৃথিবীর ইতিহাসও অন্যরূপ হইত।

কলম্বস পাখীর সাহায্য লাভ করিয়া সার্থকতা লাভ করিলেন ও পৃথিবীর ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় রচনার ভিত্তি সৃষ্টি করিয়া দিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আর এক অধ্যায়ে একটি বিরাট ব্যর্থতা নিবারিত হইতে পারিত যদি দূরদেশগামী যাযাবর পাখীর চরিত্র অনুধাবণ করা হইত। নেপোলিয়ন যখন রুশ অভিযানে চলিয়াছেন, তখন শীতের প্রারম্ভে তিনি পোল্যাণ্ডে উপস্থিত হন। সেই সময় উত্তরাপথ ও সাইবেরিয়া হইতে বহু বিহঙ্গ পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপের অভিযানে চলিয়াছে। নেপোলিয়নের কয়েকজন সহকর্ম্মী এই বিষয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নিদারুণ শীতের আগমন সম্বন্ধে সচেতন করেন। কিন্তু পাখীদের এই স্পষ্ট ইঙ্গিত অবহেলা করায় শুধু শীতের

দ্বারাই পরাজিত হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হয়। ইউরোপের ইতিহাসেও নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়।

বহুপূর্ব্বে কবি কালিদাসও কতকগুলি পাখীর যাযাবর-ধর্ম্ম লক্ষ্য করেন। রাজহংসের দেশভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল এতখানি উদ্দীপিত হইয়াছিল যে এই রাজহংস কোন পথে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করে তাহার সন্ধান তিনি লইয়াছিলেন।

যদি আমরা আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে পক্ষিজীবনের আলোচনা আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত করিতে পারি তবে স্থানীয় পাখীর গমনাগমন যাতায়াতের পর্য্যবেক্ষণের চেষ্টার ফলে হয়তো এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহশীল কতকগুলি ব্যক্তির উদ্ভব হইবে এবং ভারতের পাখীদেরও গতিবিধি সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইবে।

যাযাবর পাখীরা শীতকালে এক দেশে থাকে এবং গ্রীষ্মকালে সে স্থান ছাড়িয়া বহুদূরদেশে গমন করে। এই যাতায়াত এক বিরাট প্রহেলিকা। এই পুস্তকে দুই একটি যাযাবর পাখী স্থান পাইয়াছে। উহাদের ছাড়া হংস, কাদাখোঁচা, মুনিয়া প্রভৃতি পাখীও শীতকালেই এদেশে আসে। এদেশে ও অন্য দেশেও পাখীদের গতিবিধি উত্তর-দক্ষিণে হয়। তবে পূর্ব্ব-পশ্চিমে যাতায়াতও কোনও কোনও পাখী করে। নিউজীল্যাণ্ডে এক প্রকার দীর্ঘপুচ্ছ কটা রঙের কোকিল আছে যারা সেখান হইতে ফিজি ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জে চলিয়া যায়।

অনেকগুলি পাখী দুই তিন হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে। দীর্ঘপাদ, দীর্ঘগ্রীব ফ্লামিঙ্গো পাখী সুদূর সাইবেরিয়া হইতে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যায়। পথে অবশ্য থামিতে থামিতে যায়। ভারতবর্ষেও ইহারা কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করে। আমেরিকার স্বর্ণটিট্টিভও আলাস্কা

হইতে হাওয়াই দ্বীপে দুইহাজার মাইল পথ একটানা উড়িয়া হাজির হয়।

একই প্রকারের পাখী একই সঙ্গে যাত্রা করে না। দলে দলে এরা রওনা হয়, কেহ আগে, কেহ পরে। এই দলগুলি সব সময় পারিবারিক দল হয় না। বিভিন্ন পরিবার একত্র হইয়া চলে। সব সময় যে জনকজননী পুত্রকন্যাদের সঙ্গে লইয়া আসে তাহাও নহে।

যাযাবর পাখীদের অনেকে রাত্রেই ভ্রমণ করে, দিনের বেলা ভূমিতে অবতরণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে এবং বিশ্রাম করিয়া লয়। কতকগুলি আবার দিনেও ভ্রমণ করে। হাঁসকে রাত্রেই উড়িয়া যাইতে শোনা যায়। কতকগুলি পাখী রাত্রে উড়িয়া চলিবার সময় কণ্ঠধ্বনি করিতে করিতে চলে। বিহার প্রদেশে বাসকালে বহু রাত্রে হংসের কলকণ্ঠধ্বনি শয্যায় শায়িত অবস্থায় গভীর রাত্রে শ্রবণ করিয়া নিদ্রার আবেশে মনে হইয়াছে যেন কোনও স্বপ্নপুরী হইতে নৃত্যপরায়ণা অপ্সরীর নূপুরশিঞ্জিনী কানে ভাসিয়া আসিতেছে।

আর একটা কৌতুককর ব্যাপার এই যে বারবার পাখী একই স্থানে ফিরিয়া আসিয়া থাকে। আপনার ঘরের পাশে যে খঞ্জনদম্পতি সহসা আবির্ভূত হইয়া পুচ্ছনৃত্যে আপনাকে অভিবাদন করে, সে পূর্ব্ববৎসরও সেইখানেই হয়তো আসিয়াছিল—আবার পরবৎসরও আসিবে।

ফ্লামিঙ্গো পাখীকে দিনের বেলা পথ চলিতে দেখিয়াছি। একদিন সকাল আন্দাজ ৮টার সময় ওয়াল্টেয়ারে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া দেখি এক ঝাঁক ফ্লামিঙ্গো বলাকার মত সমুদ্রজলের ১০।১২ হাত উপর দিয়া দক্ষিণদিকে উড়িয়া চলিয়াছে। তীর হইতে তাহারা অর্দ্ধমাইল মাত্র দূরে ছিল। তাহারা সোজা সমুদ্রের উপর দিয়া উড়িয়া গেল। তীরের দিকে আসিতে দেখিলাম না।

মুনিয়া পাখীদের ঝাঁক আমি দিনের বেলাতেই লক্ষ্য করিয়াছি। মনুষ্যদৃষ্টি এড়াইয়া আকাশ পথে অতি উচ্চে খুব কম পাখীই যায়। এইরূপ ভ্রমণের সময় খুব বেশী দ্রুতগতিতে ইহারা চলে না। স্বাভাবিক উড়িবার গতিবেগই যথেষ্ট বলিয়া ইহারা মনে করে। ছোট ছোট গায়ক পাখীরা ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বেগে সাধারণতঃ চলে। বড় পাখীরা ঘণ্টায় ৪০ মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে হংস জাতীয় পাখীরা ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গমন করে। কেবল পারাবতই একটু বেশী বেগে চলে, বিশেষ করিয়া "হোমিং" পারাবত—যাহাদিগকে সংবাদ আদান প্রদানে আজও যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় বর্ম্মাপ্রান্তে লড়াইয়ের সময় পথভ্রষ্ট দুই একটি এরূপ পারাবতকে কেহ কেহ কলিকাতায় নিজগৃহে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

বৈজ্ঞানিকের নীরস গবেষণা ছাড়িয়া দিলেও, পক্ষিজীবনের বিবিধ রহস্য সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা শুধু যে আনন্দ বর্দ্ধন করে তাহা নহে, অবিকশিত চিত্তের রুদ্ধদুয়ারের ফাঁক দিয়া কিছু আলোকের রশ্মিপাত করিয়া মনের মণিকোঠার অন্ধকারও দূর করিতে পারে। যদি বাঙ্গলার ছাত্র ও অভিভাবকদের অল্প কয়েকজনের মনেও এই বিষয়ে কৌতূহল সঞ্চারিত হয়—তাহা হইলেই এ পুস্তিকা প্রকাশ সার্থক হইবে। এই পুস্তকে বর্ণিত পাখীদের এক এক জিলায় এক এক প্রকার চলতি নাম আছে। ঐ সকল সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সুরসিক পাঠক যদি আমাকে লিখিয়া জানান—ভবিষ্যত সংস্করণে তাহা স্বীকৃত হইবে।

* *
*

পরিশিষ্ট — ১

গ্রন্থ-নির্ঘণ্ট

১। "Fauna of British India," পাখী সম্বন্ধে খণ্ডগুলি, প্রথম সংস্করণ, Blanford এবং Oates সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ—Stuart Baker কর্তৃক সম্পাদিত।

২। "Common Birds of Bombay" By. E. H. A.

(E. H. A. র অন্যান্য পুস্তকও পঠিতব্য)

৩। Douglas Dewar এর নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি :—

"Indian Birds: A key;" "Calender of Indian Birds"; "Birds of the Plains"; "Birds of the Hills"; "Birds of an Indian village".

৪। "Some Indian Friends & Acquaintances"

—D. D. Cunningham.

৫। Frank Finn এর নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি :—

"Birds of Calcutta"; "Garden & Aviary Birds of India"; "Game Birds of India".

৬। M. R. N. Holmer এর নিম্নলিখিত দুইখানি :—

"Indian Bird Life"; "Bird study in India".

৭। "Common Birds of India"—Bainbrigge Fletcher

(ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ)

৮। "Pet Birds of Bengal"—vol. I.—Dr. Satya Churn Law, M. A., Ph. D., P. R. S. etc (একখণ্ডই মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে)

৯। Dr. Satya Churn Law কৃত নিম্নলিখিত দুইখানি পুস্তকও দ্রষ্টব্য—"কালিদাসের সাহিত্যে বিহঙ্গ" এবং "পাখীর কথা"।

পরিশিষ্ট—২

এই পুস্তকে বর্ণিত পাখীদের বৈজ্ঞানিক নাম

(ল্যাটিন নামের প্রথমাংশ গণ (genus) এবং শেষাংশ জাতি (species) বাচক)

দোয়েল—Copsychus saularis কপসিকাস্ সলারিস্

শ্যামা—Cittocincla macrura সিট্টোসিঙ্কলা ম্যাকরুরা

কালোবুলবুল—Molpastis bengalensis মোলপাসটিস্ বেঙ্গলেনসিস্

সিপাহী „ — „ haemorrhous „ হীমরুস

দাঁড়কাক—Corvus macrorhyncus করভাস ম্যাক্রোহ্রিঙ্কাস্

পাতিকাক— „ splendens „ স্প্লেণ্ডেন্স্

কোয়েল—Eudynamis honorata ইউডিনামিস অনরেটা

পাপিয়া—Hierococoyx varius হিয়েরোকক্কিক্স ভেরিয়াস

বৌ কথা কও—Cuculus micropterus কুকুলাস মাইক্রপটিরাস

শাখীবুলবুল—Coccystes jacobinus কক্সিসটিস জ্যাকোবিনাস

কানাকুয়া—Centropus sinensis সেণ্ট্রোপাস সিনেনসিস

শালিক—Acridotheres tristis অ্যাক্রিডোথিরিস ট্রিসটিস্

গোশালিক—Sturnopaster contra—ষ্টার্ণোপাষ্টার কনট্রা

গাঙশালিক—Acridotheres gingianus অ্যাক্রিডোথিরিস জিন-জিয়ানস

ছাতারে—Crateropus canorus ক্র্যাটিরোপাস ক্যানোরাস

নীলকণ্ঠ—Coracias indica কোরেসিয়াস ইণ্ডিকা

ছুদে মাছরাঙা—Alcedo insipida অ্যালকিডো ইনসিপিডা

শ্বেতবক্ষ „ —Halcyon smyrensis হ্যালসিওন স্মার্নেনসিস্

কুটকী „ —Ceryle varia সেরিল ভেরিয়া

হাঁড়ি-চাচা—Dendrocitta rufa—ডেণ্ড্রোসিটা রিউফা

ফিঙে—Dicrurus ater ডিকরুরাস্ এটার

হলদে পাখী — { Oriolus kundu ওরিওলাস কুণ্ডু
Oriolus melanocephalus ওরিওলাস মেলানোকেফেলাস }

হুপো—Upupus indica ইউপুপাস ইণ্ডিকা

কাঠঠোকরা—Brachypternus aurantis ব্র্যাকিপটরনাস অরান্টিস

বড় বসন্ত—Cyanops asiatica কাইয়ানোপস এসিয়াটিকা

ছোট „ —Xantholaema haematocephala জ্যানথোলিমা হেমাটোকেফালা

খঞ্জন—Motacilla alba মোটাসিলা অ্যালবা

„ melanope „ মেলানোপ

„ maderaspatensis „ ম্যাডেরাসপ্যাটেনসিস

বাঁশপাতি—Merops viridis মেরপস্ ভিরিডিস

বিষয়-নির্ঘণ্ট